ক্ষুধার্ত পৃথিবী

শ্রীবিমলাচরণ চৌধুরী

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৬১

মূল্য আড়াই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৫.২—১২. ৫. ৫৪

উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্য পিতৃদেবের

শ্রীচরণে—

গ্রন্থকার

ক্ষুধার্ত পৃথিবী

বৃদ্ধ অবিনাশের চোখের কোণে জল দেখা দেয়। কিন্তু আত্মসংবরণ করিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা এই বৃদ্ধের মধ্যে আছে এখনও। বয়স আশী বৎসরের উপর হইলেও ইদানীং একটু অসহায় ভাব ব্যতীত অপর বিশেষ কোন লক্ষণই তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে নাই। সেদিন মূর্ছা ভাঙিবার পর হইতে সে ভাবটা যেন একটু ভালভাবেই ধরা পড়ে তাঁহার কথাবার্তায়।

কি যেন চিন্তা করেন অবিনাশ। তারপর নিবারণের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠেন, জান নিবারণ, ওরা আর আসবে না। ওরা কিছুতেই আসতে পারে না—দেখো তুমি, আমি বলছি।

নিবারণ সহসা কোনও উত্তর দিতে পারে না। সে বৃদ্ধের মুখের দিকে একবার তাকাইয়াই মাথা নত করিয়া লয়। কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া বাতাস করিতে থাকে।

পুনরায় অধীরভাবে অবিনাশ বলিতে থাকেন, দেখ, গঙ্গাধর সত্যিই তারটা করেছে তো? কতদিন তাকে দেখি নি—ভেবেছিলাম, এবার তাদের কাছে পাব। না, তারা আসবে না, তুমি দেখো।--কাতরতার সহিত কথাগুলি বলিয়া বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করেন।

এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল নিবারণের মনে। তাহা সত্ত্বেও যেন প্রবোধ দিবার জন্যই সে বলে, না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না অমন। ব্যস্ত হবার কিছুই নেই, তাঁরা নিশ্চয়ই আসবেন। আপনি এমন অসুস্থ তা জেনে কি তাঁরা না এসে থাকতে পারেন?

ভেবে-চিন্তে উত্তর দিলে বোধ হয়, না? উত্তর দিতে দেরি করলে যে? তোমার মনে সন্দেহ আছে নিবারণ, তোমার সন্দেহ আছে।—অবিনাশ হাসেন। বিবর্ণ মুখের সে ম্লান হাসি বড় করুণ দেখায়।

ধরা পড়ায় নিবারণ বিব্রত বোধ করে। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলে, না না, তা কেন! এই তো শুনলাম তাঁরা নাকি চিঠিপত্র দিয়ে দত্ত মশায়ের কাছ থেকে নিয়মিত খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। তার ওপর আরও শুনেছি, আপনার নাতি-নাতনীদের নাকি আপনাকে দেখবার জন্যে আগ্রহও খুব আছে।

তা আছে, কিন্তু শশধর তাদের বোধ হয় আসতে দেয় না।—নিবারণের মুখের দিকে কাতরভাবে তাকান বৃদ্ধ। সঠিক কারণ না জানিলেও কিছু কিছু জানিত নিবারণ—নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ আলোচনা সে শুনিয়াছে। তথাপি বৃদ্ধের কথায় সে আশ্চর্য না হইয়া পারে না। সে প্রশ্ন করে, কেন? আসতে না-দেবার কি কারণ থাকতে পারে?

কেন? কারণ আমি তাদের নাতি-নাতনীর মর্যাদা না দিই যদি—এই ভয়ে।—থামিয়া বলেন, অবাক হ'লে না কি? শোন নি সে কথা?—নিবারণের ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠে, স্পষ্ট লক্ষ্য করে নিবারণ। তাহার মুখ হইতে অতর্কিতে বাহির হইয়া যায়, ও, তা আর অসম্ভব কি!

এই অঞ্চলে সে নবাগত হইলেও এই প্রাচীন অট্টালিকা ও তাহার মালিক এই বৃদ্ধ জমিদারের সম্বন্ধে বহু কথা ইতিমধ্যেই তাহার জানা হইয়া গিয়াছে। জমিদারি বর্তমান আছে সামান্যই। শোনা যায়, এক কালে নাকি বিরাট অবস্থা ছিল মজুমদার মহাশয়দের। প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এখন। আরও অনেক কথা জানে নিবারণ, কিন্তু এ কথার জন্য সে যেন প্রস্তুত ছিল না আজ। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে নিবারণের। কেমন একটা অস্বস্তিকর ও অর্থপূর্ণ স্তব্ধতা বিরাজ করে দুইজনের মাঝখানে।

বৃদ্ধ যেন চমকিয়া উঠেন। আবেগের সহিত বলিতে থাকেন, তুমি সব কথা জান না বোধ হয়। তুমি সব জান না, নিবারণ। শোন, বলছি আমি।—ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় অবিনাশের কথায়। মনে হয় হৃদয়ের ভার লাঘব করিবার জন্য কি যেন তিনি বলিতে চান। অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

নিবারণ বৃদ্ধের অস্থিরতা লক্ষ্য করে। সে সান্ত্বনা দিয়া বলে, না না, আপনি ক্লান্ত ও-সব চিন্তা ক'রে মিছিমিছি কষ্ট করবেন না দাদু। সারারাত্রি ঘুম হয় নি আপনার। ডাক্তারবাবু ব'লে গেছেন, আপনার ঘুমই দরকার। আপনি চুপ ক'রে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন তো।

কিসের জন্যে? দু দিন বেশি বাঁচবার জন্যে তো? বেঁচেছি তো অনেক দিন, তবে আর কেন? কিন্তু শোন নিবারণ, আজ একটু হালকা হয়ে, দু দণ্ড হ'লেও, ভালভাবে বাঁচতে চাই আমি। শোন যা বলছি।—অনুরোধ করেন অবিনাশ। মিনতি ও অসহায়ের ভাব তাঁহার প্রতিটি কথায় প্রকাশ পায়। নিবারণের মন ব্যথিত হইয়া উঠে। সে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলে, আচ্ছা, শুনছি—আগে ওষুধটা খেয়ে নিন, তারপর।

সাড়ে আটটা বাজিল। এক দাগ ঔষধ খাইতে দেওয়া হইল। একটু পরে দুধ খাইতে দিতে হইবে কয়েক আউন্স। ঔষধ খাইবার পর অবিনাশ বলেন, খোল ওই দেরাজটা।—টেবিলটার দিকে দেখাইয়া বলেন, দেখ, দুখানা চিঠি রয়েছে ওখানে, তিরিশ বছর ধ'রে রয়েছে। যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি, প'ড়ে দেখ। কি, পেয়েছ?

হ্যাঁ, পেয়েছি।

পেয়েছ! বেশ, পড়।

অনেকটা বাধ্য হইয়াই যেন নিবারণকে চিঠিগুলি বাহির করিতে হয়। প্রাচীন জিনিসের প্রতি সে কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব

করে। অবিনাশের প্রতি তাহার স্নেহের ও মমতার অন্যতম কারণ বোধ হয় তাঁহার প্রাচীনত্ব। সে আগ্রহের সহিত চিঠিগুলি মনে মনে পড়িতে থাকে—

শ্রীচরণেষু

শতকোটী প্রণাম অন্তে নিবেদন এই যে, আপনার পত্র পাইলাম। আপনি লিখিয়াছেন—ব্রাহ্মদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ আপনি কল্পনাও করিতে পারেন না। উহাদের রুচি, নীতি, শিক্ষার ধারা ভিন্নপ্রকারের। আরও বলিয়াছেন—ইহা আমার উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কিন্তু মানুষে মানুষে প্রভেদ তো আমি বিশ্বাস করি না। এ বিবাহ আমার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রয়োজন এবং আপনার বিনানুমতিতে হইলেও ইহা আমি করিব স্থির করিয়াছি।

পরিণতি যে কি, তাহা আমি জানি না—জানিতেও ইচ্ছা করি না। হয়তো বা চরম দুঃখ আমার জীবনে আসিতে পারে অথবা ইহা হইতে আমি চরম আত্মপ্রসাদও লাভ করিতে পারি।

জীবনকে আমি সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছি। সহজ সরল পথে চলিবার শিক্ষা তো আপনার নিকট হইতেই পাইয়াছি। মানুষের এই বিরাট সমাজের ভিতর আমি মাত্র একজন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই। সুখ, দুঃখ, নৈরাশ্য ও সাফল্যের যে কোন অবস্থাই আমার জীবনে ঘটিতে পারে, তাহাতে সমগ্রভাবে মনুষ্য-সমাজের ক্ষতি-বৃদ্ধিই বা কি? আপনি অহেতুক কেন আমার সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইতেছেন?

আশা করি চেষ্টা করিলে আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিবেন। ইতি ১৯।২।২০

আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী

শশধর

নিবারণ বিস্মিত হয়। তাহার মনে হয়, অতীত যেন অবরুদ্ধ হইয়া পত্রের মধ্য হইতে প্রলাপ বকিয়া চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের জীবনের অন্তত একটি অধ্যায়ের রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে। তাহার কৌতূহল বাড়িয়া যায়। অপর পত্রখানিও সে খুলিয়া পড়ে।

শ্রীচরণেষু

শতকোটী প্রণাম অন্তে নিবেদন এই যে, গতকল্য আমার ১৯।২।২০ তারিখের লিখিত পত্রের উত্তর পাইয়াছি।

অপরিণত বয়সের সিদ্ধান্ত মাত্রই ভুল—ইহা বলে চলে না। বরং বলা চলে, ইহাতে অনভিজ্ঞতাজনিত ত্রুটি থাকিয়া যাইতে পারে, বিপদের আশঙ্কা থাকিতে পারে। আমার এই বিশেষ ক্ষেত্রে ইহাকে ভাববিলাস কিংবা ভাবপ্রবণতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ভাবশূন্য জীবন কল্পনা করিতে পারি না। ভাব প্রকাশ করাতে বিলাস হয় না।

লিখিয়াছেন আমার শিক্ষা ও জীবনের ব্যর্থতার কথা। মনে হয়, তাহাও আপনার বিচারের ভুল। জীবনকে আপনি আপনার সময়ের মাপকাঠি দ্বারা বিচার করিতেছেন; কিন্তু সময়ের যে যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা তো আপনার অজ্ঞাত নহে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না করিয়া লইলে বিচারে ভুল থাকিয়া যাইবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন যে কিছু পরিমাণে না হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু সময়ের গতিশীলতার সহিত কখনও কখনও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়ে। সেই হেতু সময় সময় ইহাকে স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী কম কিংবা বেশি পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া লইতে হয়। সময় ও জীবন স্বাধীন। তাহারা তাহাদের শাশ্বত শক্তি লইয়া অবিরামভাবে বহিয়া চলিয়াছে।

আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ—আপনাকে এ সকল বিষয় লেখা ধৃষ্টতা মাত্র।

আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য আমি কয়েকদিনের মধ্যে একবার জনকপুরে যাইব ইচ্ছা করিতেছি। ইতি ৩৩২০

সেবকাধম

শশধর

নিবারণ মুখ তুলিলে বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন, কি, শেষ হয়েছে পড়া? তারপর বলিতে থাকেন, ত্রিশ বছর আগে এই ঘরে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই সে প্রণাম ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল—তা হ'লে এই বিয়েতে আপনি মত দেবেন না? আমি বলেছিলাম উত্তেজিত ভাবে, না, না ও সব কথা আর ব'লো না আমাকে। মাথা নত ক'রে সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। তারপর বলেছিল— ক্ষমা করবেন বাবা, আমি এ বিবাহে প্রতিশ্রুত।

প্রতিশ্রুত?

হ্যাঁ, প্রতিশ্রুত

ও, তা হ'লে তো তুমি কষ্ট পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই রয়েছ দেখা যাচ্ছে। তবে আর তোমাকে ব'লে লাভ কি! বড় ঘৃণা হয়েছিল মনে, নিবারণ, বড় ঘৃণা। ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলাম তাকে, আমার ছেলে হয়ে—না না, আমার কাছে আর এসো না তুমি, কোনদিন এসো না। আমি তোমার মুখ পর্যন্ত দেখব না। প্রণাম ক'রে সে সেদিন চ'লে যায়।

যাবার আগে সে তার মায়ের অয়েল-পেন্টিংটার দিকে তাকিয়েছিল একবার। ওই ছবি আর ওই-কোণটার মাঝে একটা মাকড়সা জালের ফাঁদ বুনছিল তখন, সে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তারপর থেকে একদিনের জন্যেও শশধরকে এ বাড়িতে পাই নি দাদু। ডাকি নি তো তাকে। এবার কি সে আসবে? সে আসবে না।—বৃদ্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার যেন ইহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হইতেছে মনে হয়।

নিবারণ হঠাৎ যেন নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া লজ্জিত হইয়া

পড়ে। তাহার যেন মনে হয়, বৃদ্ধের সহিত এই আলোচনা তাহার পক্ষে অন্যায় ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে এবং তাহার জন্যই বৃদ্ধ এইরূপ বকিয়া চলিয়াছেন। তাড়াতাড়ি দুধের কাপটা হাতে তুলিয়া লইয়া সে বলে, দাদু, একটু দুধ খান।

অবিনাশ অল্প অল্প করিয়া দুধ পান করেন। নিবারণের নিকট তাঁহার কোন ওজর-আপত্তি খাটে না।

অসুখটা এমন কিছু নয়। জমিদারি যৎসামান্য যাহা আছে তাহার আয়ে একটি হাই-স্কুল, একটি হাসপাতাল এবং কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ জীউয়ের সেবা ভালভাবেই চলিয়া যায়। সংসারে দেখিবার শুনিবার লোকের মধ্যে আছেন নীরদা ঠাকুরাণী। গঙ্গাধর আছে, জমিদারি দেখাশুনা করে—শশধরের প্রায় সমবয়সী, পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সংসারে অপর খরচপত্র বিশেষ কিছুই নাই। দোল দুর্গোৎসব না করিলেই নয়। তবুও দুর্ভিক্ষের বৎসর হইতে মাঝে মাঝে আর্থিক অনটন যে না দেখা দিত তাহা নহে। প্রজাদের উপর আদায়-ওয়াশীলের জন্য সামান্য চাপ দিতে হইত মাঝে মাঝে।

পচু বাগদী ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে হাসপাতালে যাইতেছিল। তাহার মেয়েটা আজ চার-পাঁচ দিন হইল জ্বরে ভুগিতেছে, জ্বর ছাড়ে না। পর পর দুইটি সন্তান নষ্ট হইবার পর পচুর এই মেয়েটির জন্ম হয়। অধিকন্তু ইহার কিছুদিন পরে পচু একখানি টিনের ঘর এবং বিঘা দুই-তিন জমিজমাও করে। সেইজন্য মেয়েটি অসম্ভব রকম আদরের, কারণ তাহার স্ত্রীরও ধারণা মেয়েটি নিশ্চয়ই পয়মন্ত। পচুর মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে হন্তদন্ত হইয়া মজুমদার-বাড়ির উপর দিয়া হাসপাতালের দিকে যাইতেছিল।

কে যায়? পচু নাকি?—জিজ্ঞাসা করে গঙ্গাধর।

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

শোন পচু, শোন। কর্তা একবার ডেকেছেন তোমাকে। তোমাকে তো আমি কিছুতেই পেরে উঠলাম না। দু-দু সালের খাজনা বাকি, তার ওপর আবার আরও এক সাল চ'লে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখ, যা বলবার তা তুমি কর্তাকে নিজেই ব'লে যাও, আমি আর তোমার পেছনে পেছনে ঘুরতে পারি না বাপু।—বিরক্তির সহিত বলে গঙ্গাধর।

পচু প্রস্তুত ছিল না। কথাগুলি তাহার ভাল লাগিল না। কয়েকদিন পূর্বে এক ছোকরাবাবু বক্তৃতা দিয়া গিয়াছেন, 'লাঙ্গল যার মাটি তার'। সে বক্তৃতার রেশ তখনও তাহার মাথার ভিতর বাসা বাঁধিয়া বসিয়া ছিল। সে অকস্মাৎ দাঁত-মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর দিয়া ফেলিল, খাজনা? কিসের খাজনা? আমি খাজনা-টাজনা দিতে পারব না। তাহার পর বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে থাকে।

আজ পর্যন্ত মজুমদার-বাটীতে কোন প্রজার মুখ হইতে এইরূপ উত্তর শোনা যায় নাই। দয়ালু জমিদার বলিয়া তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক সুখ্যাতিও ছিল প্রচুর।

বৃদ্ধ অবিনাশ বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন। একটু পূর্বে পাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয় কথায় কথায় শশধরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ফেলেন। সেইজন্য তাঁহারও মনের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। নিজে যাহাই চিন্তা করেন না কেন, অপর কেহ তাঁহার নিকট শশধরের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তাঁহার আর বিরক্তির সীমা থাকে না। পচুর কথাগুলি তাঁহার কানে যাইতেই তিনি যেন গর্জন করিয়া উঠিলেন, কে? গঙ্গাধর, কে?

আজ্ঞে, পচু।

ধ'রে আন ব্যাটাকে, ধ'রে আন।—চিৎকার করেন অবিনাশ, এতবড় আস্পর্ধা!

পচুকে আর ধরিতে হইল না। অবিনাশের শরীর কাঁপিতে লাগিল।

হঠাৎ যেন চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল, তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। গঙ্গাধর ও পচু ধরাধরি করিয়া দ্বিতলে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিছানাতে শোওয়াইয়া দিল।

নীরদা ঠাকুরাণী প্রথমে চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা কোপনস্বভাবা। একবার ক্রুদ্ধ হইলে আর রক্ষা নাই। প্রাণের সাধ না-মিটা পর্যন্ত কাজকর্ম বন্ধ করিয়া বসিয়া বসিয়া গালিমন্দ করেন। ইংরেজী গালিই বেশি। পচুর উদ্দেশে গালিবর্ষণ শেষ করিয়া অবশেষে তিনিও অবিনাশের মাথায় জল ঢালিতে লাগিলেন। শরৎ ডাক্তারকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠানো হইল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে জ্ঞান হইল। অস্ফুট কাতরোক্তি শুনিয়া মনে হয় তাঁহার মাথায় তখন অত্যন্ত যন্ত্রণা রহিয়াছে। ডাক্তারবাবু গোপনে বলিলেন, চিন্তা-ভাবনা থেকে হয়েছে আর কি। ব্লাড-প্রেসারটা বেশি— এসব কেস খুব সিরিয়াস হয়। সন্ন্যাস-রোগের মত কিনা, সেইজন্য বিপদের আশঙ্কা খুব বেশি। যা হোক, স্ট্রোকটা খুব সামলে নিয়েছেন উনি। সেবা-যত্নের দরকার খুব ভালভাবে। না না, ভয়ের আর কোন কারণ নেই, ভাল হয়ে যাবেন শিগগিরই। তবে দেখুন নিবারণবাবু, ঘুম না হ'লে তো চলবে না। ঘুম ওঁর দরকার—ঘুমের ওষুধ দেওয়া থাকল সেইজন্যে। আর শুনুন, ওঁকে উঠতে দেবেন না কিছুতেই। তারপর অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আপনি উঠতে যাবেন না যেন, আর ওষুধ যা লিখে দিয়েছি সেটা খাবেন নিয়মমত, বুঝলেন? বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানান। ডাক্তারবাবু উঠিয়া পচুর বাড়ির দিকে চলিয়া যান। পচুর মেয়ে আজ চার-পাঁচ দিন যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছে।

দুধ খাওয়াইয়া কাপটি শিয়রের টেবিলের উপর রাখিবামাত্র বেলা নয়টার ট্রেনের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। অবিনাশ কেমন যেন ব্যস্ত হইয়া

পড়িলেন। তিনি দক্ষিণের জানলার দিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন। দ্বিতলের এই জানালা হইতে স্টেশনটি এখনও সম্পূর্ণ দেখা যায়। কিছুদিন পরে ওই গৃহটির নির্মাণকার্য শেষ হইলে হয়তো তাহা অন্তরালে পড়িয়া যাইবে, আর দেখা যাইবে না। ত্রিশ বৎসর পূর্বে ওই যে ছোট মাঠে বটগাছটি ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না—এখন সে স্থানে কত না বাড়িঘর, কত না পরিবর্তন! তালপুকুরের পাশ দিয়া একটি হাঁটাপথ বটগাছকে বাম দিকে রাখিয়া স্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। শশধর যখন দশ-বারো বৎসরের তখন ওই রেলপথ খোলা হয়—সেও প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। শশধরের মাতা নিস্তারিণী দেবী তাহার পরের বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এই নয়টার গাড়িতেই তাঁহার পিত্রালয় মথুরাপুরে গিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই। মথুরাপুর রায়বাটীতে সেবার সেই মহাপূজার সময় হাহাকার উঠিয়াছিল নিস্তারিণীর মৃত্যুতে। নিস্তারিণীর বিসূচিকা হইয়াছিল।

আর তাহারই দশ বৎসর পরে এমনই একটি দিনে এই নয়টার গাড়িতেই চলিয়া যায় শশধর—মজুমদার-বংশের একমাত্র সন্তান। জীবনে এই বাঁশীর শব্দ অবিনাশের নিকট কত পরিচিত যেন। অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় কলিকাতা হইতে যে ট্রেনখানি আসে তাহাতে শশধর একদিনের জন্যও তো ফিরিল না! শশধর ফিরিলে তাহাকে কি খাইতে দিবেন, কোথায় তাহার শুইবার ব্যবস্থা করিবেন—সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কত শত কথা বৃদ্ধ কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছেন দিনের পর দিন।

অবিনাশ জানালার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। জানালার নীচেই একটি ফুলের বাগান, অযত্নে এখন আর বিশেষ কোন সাজসজ্জা নাই। পুরাতন প্রাচীরের এক স্থান ধসিয়া পড়িয়াছে। জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ অবিনাশের ভগ্ন-রুগ্ন বাগানটি। তবুও কামিনীফুলের গাছ তিন-চারিটি আছে এখনও, তাহাতে ফুল ধরে। আর বর্তমান আছে বাগানের দক্ষিণ দিকে

পুষ্করিণীর ধার ঘেঁষিয়া ঝাউগাছের একটি সারি, গাছগুলি খুবই উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দিরের চূড়া ছাড়াইয়া গিয়াছে প্রায়।

আর আছে এখানে সেখানে দুই-চারি ঝাড় ফুলগাছ—চামেলী, যুঁই, হাসনুহানা। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ভুঁইচাঁপাও দেখিতে পাওয়া যায় দুই-চারিটি।

বাগান অতিক্রম করিলেই তালপুকুর। প্রায় দীঘির মত স্বচ্ছ জল। শান-বাঁধানো ঘাট, তাহাতে মেরামতের চিহ্নগুলি স্পষ্ট বোঝা যায়। শনিদশাগ্রস্ত ধনীর পরিচ্ছদের ন্যায় কালের নির্দয় ছাপ মাখানো, কিন্তু স্তব্ধ ও গভীর। ঝাউগাছের শব্দ দীর্ঘনিশ্বাসের মত মনে হয়। বৃদ্ধের বড় ভাল লাগে সে শব্দ। ওগুলি তাঁহার পিতা স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন—তাঁহারই মত প্রাচীন। উহাদের সহিত অবিনাশের সখ্যভাব জন্মিয়াছিল, তিনি যেন উহাদের ভাষা বুঝিতেন—নীরব সহানুভূতিতে মুখর সে ভাষা। নিস্পন্দ দৃষ্টিতে বৃক্ষগুলির দিকে মাঝে মাঝে তাকাইয়া থাকিতেন বৃদ্ধ।

বেশ দেখা যাইতেছে, স্টেশনটি এইমাত্র লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। জনকপুরের যে কালক্রমে এমন উন্নতি হইবে তাহা ত্রিশ বৎসর তো দূরের কথা—পনের-বিশ বৎসর পূর্বেও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। একটি পাকা সড়ক স্টেশন হইতে মহকুমা-শহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল রাস্তাটি—কালো ও মসৃণ, সরীসৃপের মত। দ্বিতল হইতে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। দেখা যায়, মোটরযানগুলি ভীষণ বেগে অনবরত ছুটিয়া চলিতেছে। মনে মনে চিন্তা করেন অবিনাশ, গো-যানের সংখ্যা আজকাল কতই না কমিয়া গিয়াছে, কয়েক শতাব্দী পরে হয়তো বা গবেষণার বিষয়বস্তু হইবে।

ওই যে যেখানে চুনীলাল মোদকের দোকান, উপরে দীর্ঘ একটি বাঁশের সহিত সংলগ্ন রেডিয়োর তার দেখা যাইতেছে, বহুদিন পূর্বে

একদিন সন্ধ্যায় সেখানে একটি নেকড়ে বাঘ আসিয়াছিল—কোথা হইতে কে জানে! গঙ্গাধর বন্দুক লইয়া বাঘ শিকারে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। শশধরকে দিলে সে হয়তো পারিত। গঙ্গাধরের কাণ্ড দেখিয়া সে সেদিন হাসিয়াই অস্থির। বলে, বাবা, গঙ্গাধর যে কাঁপতে কাঁপতে বন্দুক ফেলে দিয়ে পালিয়েছে—সে কথা কিছুতেই স্বীকার করে না। বলে, খালের ধারে ঝোপটার ভেতর ডুবন্ত সূর্যের আলোতে বাঘটাকে বড় সুন্দর লাগছিল আমার। মায়া হ'ল, গুলি করতে পারলাম না। সঞ্জীববাবুর সেই কথাগুলি মনে প'ড়ে গেল কিনা, 'বন্যেরা বনে সুন্দর'—পড়িস নি, শশধর, পড়িস নি? এই তো সেদিন বেরিয়েছে লেখাটা। তারপর হাসির ধুম পড়িয়া যাইত।

ও-দিকের বাবলা-বনের ধারে কিছুদিন হইল কত বড় একটি চাউলের কলের পত্তন হইয়াছে। চিমনির ধোঁয়া দেখিয়া মনে হয় কলটি বেশ চালু আছে। উহার বাঁশীটিও আজকাল বহু পরিবারের ভিতর কর্মচাঞ্চল্য আনিয়া দেয়, তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করে।

সামান্যক্ষণ পরে ভোঁ-ভোঁ করিয়া একটি এরোপ্লেন উড়িয়া যাইবে—প্রত্যহ এই দিক দিয়া কোথায় যেন যায় উড়ো-জাহাজটি। যন্ত্রযুগের গতি ও গতিশীলতার কথা মনে করাইয়া দিয়া যায় যেন।

সব দিকেই কেমন যেন বিষাক্ত ব্যস্ততার ভাব—কেবল ছুটাছুটি। স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর কেমন যেন একটা অস্থিরতা। পিছনে কেহই পড়িয়া থাকিতে চায় না। সভ্যতার কি ইহা যৌবনদশা? প্রশ্ন জাগে অবিনাশের মনে। সত্যই সময়ের পরিবর্তন হইতেছে—পৃথিবীর রূপের পরিবর্তন আসিয়াছে। শশধর সেদিন ঠিকই বলিয়াছিল। আমিও তাহা জানতাম, কিন্তু স্বীকার করি নাই। স্বীকার করিলাম না কেন—কে বলিবে? স্বীকার করিলে কিই বা ক্ষতি হইত, আর স্বীকার না করিয়া কিই বা লাভ হইয়াছে! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন অবিনাশ—হাঁ, শুধু বিরাম নাই ওই

ঝাউগাছগুলির অবিশ্রান্ত হু-হু শব্দের। ওরা কি থামিবে না? তারপর যেন আপন মনেই বলিয়া ওঠেন, ওরা যেন না থামে। ওরা থামিলে আমি কাহাকে লইয়া বাঁচিব? ওরা যে আমার বন্ধু, আমার সখা।

আমি এখন উঠি দাদু। ইস্কুলের সময় হ'ল প্রায়। শচীনকে পাঠিয়ে দিই গে।—দ্বিধার সহিত বলে নিবারণ। অনুমতির জন্য বৃদ্ধের মুখের দিকে সে তাকাইয়া থাকে। না না, অবিনাশ এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া যাইবেন। মুখের সেই বিবর্ণ ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে যেন, মনে হয় ধীরে ধীরে তিনি যেন শক্তি ফিরিয়া পাইতেছেন। নিবারণ ভাবে, তবে আর কোন ভয় নেই, অবিনাশ সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত।

বৃদ্ধ সে কথার উত্তর দেন না, তিনি তখনও চিন্তায় বিভোর। মনে হয়, অন্যমনস্কভাবেই তিনি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দেন।

দিদিমা, ও দিদিমা!—নিবারণ ডাকে নীরদা ঠাকুরাণীকে। উত্তর পায় না, তবুও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া চলে, দিদিমা, আমি বাসায় যাচ্ছি, আপনি একটু কাছে এসে বসুন। হ্যাঁ দেখুন, ওঁকে উঠতে দেবেন না যেন। আর কাগজে-মোড়া যে ওষুধের বড়ি রয়েছে না, তার একটা খাইয়ে দেবেন দশটার সময়।

এতক্ষণে দিদিমা ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন, ব্যস্তসমস্তভাবে প্রশ্ন করেন, কি বলছিলে? কোন্ ওষুধটার কথা বলছিলে তুমি?

ওই যে হলদে বড়ি। সাদাও রয়েছে। সাদা নয় কিন্তু, বুঝলেন? এমনি যদি গিলে খেতে কষ্ট হয়, তবে জলে গুলে খাইয়ে দেবেন, কেমন? আর এর মধ্যে শচীন এসে যায় যদি, তবে তো চিন্তার কোন কিছুই থাকবে না। আমার এদিকে আবার ইস্কুলের বেলা হ'ল।

নিবারণ যাইতে উদ্যত হয়।

তুমি আবার কখন আসছ?

আমি দেড়টা নাগাদ আসব। আজ শনিবার শিগগির শিগাগর ইস্কুল ছুটি হবে। তারপর অবিনাশের দিকে তাকাইয়া বলে নিবারণ, দাদু, দেখুন, শচীনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—বড় ভাল ছেলে শচীন। দোষের মধ্যে একটু বেশি কথা বলে। দোহাই আপনার, আপনি কথা দিন, বিছানা ছেড়ে উঠবেন না, আর ওর সঙ্গে বকবেন না যেন।—বালকের মত আবদারের স্বর নিবারণের প্রতিটি কথায় ফুটিয়া উঠে।

অবিনাশ যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পান এতক্ষণে। ঈষৎ হাসিয়া বলেন, না না, তুমি যাও, এখন অনেক ভাল বোধ করছি। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, শশধর চারটের ট্রেনে আসবে? আসবে, কি বল? একটু থামিয়া বলেন, দেখ, গঙ্গাধরকে একবার পাঠিয়ে দিও তো আমার কাছে।

নিবারণ নীচে নামিয়া যায়। বৃদ্ধ ভাবেন, বেশ ছেলেটি। আহা, কত না মায়া-মমতাপূর্ণ কথাবার্তাগুলি! সামান্য কয়েকদিনের পরিচয়, এরই মধ্যে মনে হয় সে যেন আমার কত বড় আত্মীয়। স্বপ্নেও মনে হয় না, এ অঞ্চলে নবাগত বাস্তুত্যাগী এই যুবকটি আমার কেহই নয়। নিবারণের উপর নির্ভর করিতে, নিবারণকে কষ্ট দিতে সামান্যমাত্র সঙ্কোচ হয় না আমার। অনুরোধ করিবার অবসরও দেয় না—ভার লইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছে যেন। সত্যই অসাধারণ মমত্ববোধে ধীরে ধীরে সমগ্র গ্রামবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছে সে। এই তো একবার যখন শুনিয়াছে পচুর মেয়ে অসুস্থ, তখন তাহাকে না দেখিয়া সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না। লক্ষ্য করিয়াছি, রোগ শোক তাপ যেখানে নিবারণ সেখানে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে। চমৎকার স্বভাবটি! শিশুর ন্যায় সরল এই যুবক, চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি। কিন্তু উহার মুখ দেখিয়া সন্দেহ হয়, হয়তো বা ও দুঃখী—ব্যথা-বেদনার সুস্পষ্ট ছাপ উহার দৃষ্টিতে!

নিবারণ খঞ্জ। মনে হয়, কোন দিনের কোন অনবধানতার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে পা খানিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। নূতন যুগের গতি-সচেতনতার সীমা লঙ্ঘন করিতে চাহিয়াছিল বোধ হয়। পা উহাকে শাসন ও সংযত করিয়াছে। যে কর্মচাঞ্চল্য উহার ভিতর—ভালই হইয়াছে, পা খানি ভাঙিয়াছে, খঞ্জপদ উহার জীবনকে রক্ষা করিয়াছে, নতুবা উহার জীবন হয়তো বিপন্ন হইত।

অবিনাশ ভাবিতে থাকেন, ইস্কুলে তো প্রধান শিক্ষককে লইয়া দশ-বারো জন শিক্ষক আছেন, আর চার-পাঁচজন তো জনকপুরেই থাকেন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ সকলেই পাইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র নিবারণই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল, আর তো কেহই আসিল না।

কি? কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?—নিবারণ হাঁপাইতে থাকে।

না না, বিশেষ কিছু নয়—বয়স হয়েছে তো। পচুর ওপর একটু রাগ করছিলেন, তাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন আর কি। রাগ অভিমান করা কি আর এখন চলে, এই বয়সে! তবে ভাবনার কিছু নেই, অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।—মাথায় ও কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাক্তারবাবু বলেন, একা একা থাকা—

নিবারণ পচুর মুখের দিকে তাকায়। পচু তখনও অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ যেন আরও অপরাধী হইয়া গেল সে, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, মাস্টারবাবু, আমার মন-মেজাজটা আজ ভাল ছিল না। মেয়ে লক্ষ্মীটার বড় অসুখ আজ ছ দিন ধ'রে, তাই আমি একটু বেফাঁস কথা ব'লে ফেলেছি। আর আমি যদি জানতাম কর্তা নীচেই ব'সে আছেন তা হ'লে কি আর এমন কথা মুখ দিয়ে বের হ'ত? হায় হায়, কেন বললাম এমন কথা—আমি কি করব, বলুন? মাস্টারমশায়, আমার

কি হবে? অকপট অনুশোচনা প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ করে যেন। সামান্য দম লইয়া পচু বলে, ডাক্তারবাবু, কর্তা' এখন ভাল তো? হা ভগবান, কেন আমার এমন দুর্মতি হ'ল!—হতভম্বের ন্যায় ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকায় সে।

গঙ্গাধর!—আচম্বিতে ডাকেন অবিনাশ।

আজ্ঞে।—ব্যস্তভাবে গঙ্গাধর দত্ত অবিনাশের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে।

ক'টা বাজে?

আজ্ঞে, সাড়ে সাতটা।

শশধরকে আসবার জন্যে তার কর। এখনই তার ক'রে দাও।

আজ্ঞে, এই যাচ্ছি।—প্রসন্ন হইয়া উঠে গঙ্গাধরের মুখ। সে যেন এতদিন ধরিয়া এই আদেশের জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ত্রিশ বৎসর পর এই প্রথম শশধরের ডাক পড়িল। 'এখনই তার ক'রে দিচ্ছি।'—বলিতে বলিতে গঙ্গাধর উৎফুল্লভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। তাহার ভিতর অতিরিক্ত কর্মচঞ্চলতা প্রকট হইয়া উঠে।

নীরদা ঠাকুরাণী বলিলেন, ভোরেই উঠেছেন আজও, প্রত্যেক দিনের মত আজও সেতারে ভৈরবীর আলাপ চলছিল। ভট্‌চায মশায় তবলায় সঙ্গত করেন—তিনিও ছিলেন। কি বলব ভাই, এর মধ্যেই না পচু—আর এরই মধ্যে কী কাণ্ড! কী সর্বনাশ! আমি কি করি বল তো ভাই?—তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়ে।

না না, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এই তো ডাক্তারবাবু বলছেন, ভাল।—আশ্বাস দেয় নিবারণ।

তাই হোক, তাই হোক্ ভাই। আমি লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে মানসিক করেছি। নারায়ণ, নারায়ণ তুমিই ভরসা।—হাতজোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করেন দিদিমা। তারপর গলার স্বরটা একটু নীচু করিয়া

বলেন, কাল সারারাত্রি দোতলার বারান্দায় পায়চারি করেছেন। ঘুম হয় নি একটুও, আমি বলছি। দোল পূর্ণিমা—এই দিনই তো সে চ'লে যায়, তিরিশ বছর আগে। বোধ হয় মনটা খারাপ হয়েছিল। আর দেখ, এমনই হয় প্রত্যেক পূর্ণিমাতে—উনি কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়েন। আমি বুঝিয়েছি, ভাই, আমি বুঝিয়েছি কতবার, তা উনি কি শোনেন! বেশি বললে রাগ করেন।

নিবারণ বলিল, হ্যাঁ, কালই তো ওঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আপনার ব্রাহ্মণ-ভোজনের নেমন্তন্ন খেয়ে যখন বাইরে এসে ওর কাছে বসি তখন বলছিলেন, কলকাতায় নাকি যেতে ইচ্ছা করে—কলকাতায় যাবেন একবার। আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। ঠাট্টা ক'রে বলছিলেন—বুড়োর ভার সইতে পারবে তো? আমি বললাম, বুড়ো মানুষ, বুড়ো গাছ, বুড়ো ঘরবাড়ি, বুড়ো মন্দির, এই বুড়ী পৃথিবী—সব আমার ভাল লাগে দাদু। উনি হেসে উঠেছিলেন হো-হো ক'রে ছেলেমানুষের মত।

ডাক্তারবাবু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়েন, নিবারণকে ইশারা করিয়া বাহিরে যান। নিবারণ বাহিরে গেলে তাহার সহিত আলোচনা করেন অবিনাশের সম্বন্ধে। দরজার নিকট ঝুঁকিয়া ভিতরের দিকে তাকাইয়া বলেন, আপনি বিছানা থেকে যেন উঠবেন না আজ। ঘাড় ফিরাইয়া পচুকে বলেন, চল পচু, তোমার বাড়ি যাই, চল।

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলে নিবারণ নীরদা ঠাকুরাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলে, দিদিমা, আপনি যান; ভোগ পূজো তো আছে আবার। আমি আছি, শচীন আছে, আর ভাবনা কি! আমরা দুজনে মিলে ওঁর দেখা-শোনা করতে পারব। আর না হয় মাঝে মাঝে আপনি আমাদের দিকে একটু নজর দেবেন, কেমন? কৌতুকের সহিত বলে নিবারণ।

বৃদ্ধা যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। কৃতজ্ঞতার সহিত বলেন, তোমরা ছিলে ব'লে ভাই কত সাহস আমার। তোমরা না থাকলে কি যে

করতাম ভেবে পাই না। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া 'নারায়ণ মধুসূদন, নারায়ণ মধুসূদন' বলিতে বলিতে তিনি নীচে নামিয়া যান। নিবারণ পাখা লইয়া বৃদ্ধের শিয়রে বসিয়া পড়ে। নীচে নামিয়া মাঝের বাঁধানো প্রাঙ্গণটি পার হইয়া নিবারণ বৈঠকখানায় প্রবেশ করে। প্রৌঢ় গঙ্গাধর—শশধরের সমবয়স্ক, ডাঁট-ভাঙা চশমা সূতায় বাঁধিয়া কতদিন যাবৎ যে কাজ চালাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। চশমাটি নাকের ডগার উপর পর্যন্ত টানিয়া লইয়া কি একটা কাগজ দেখিতেছিল।

তাহাকে লক্ষ্য না করিয়াই বলে নিবারণ, দত্ত মশায়, আমি যাচ্ছি এখন, দেড়টার পর আসব আবার। শচীনকে জানেন তো? আমার ভাই। শচীনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও কি! আপনি হিসেব নিয়ে বসেছেন আজও। বাড়িতে এমন অসুখ-বিসুখ তা সত্ত্বেও! গঙ্গাধরের দিকে লক্ষ্য পড়িতেই নিবারণ যেন বিরক্ত হইয়া যায়। গঙ্গাধর অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। কাগজ রাখিয়া আমতা আমতা করিয়া বলে, তামাদির ব্যাপার কিনা—একটু জরুরী, তাই!

নিবারণ রুক্ষস্বরে বলে, রেখে দিন আপনার তামাদি—মানুষ ম'রে তামাদি হয়ে যায়, আর আপনাদের তামাদির ঝোঁক মেটে না। তারপর গলার স্বর নরম করিয়া বলে, কর্তার কাছে গিয়ে বসুন গে একটু, একা থাকা ভাল নয়। আপনাকে ডেকেছেন তিনি।

এই যে যাচ্ছি।—বলিয়া গঙ্গাধর খাপটা হাতে তুলিয়া চোখ হইতে চশমা খুলিতে খুলিতে ত্রস্তভাবে অন্দরের দিকে চলিয়া যায়।

বৈঠকখানার বারান্দায় কয়েকজন প্রজা অপেক্ষা করিতেছিল। অবিনাশের অসুস্থতার কথা শুনিয়া তাহারা সংবাদ লইতে আসিয়াছিল। নিবারণ তাহাদের জানাইয়া দেয়, কর্তা অনেক ভাল আছেন, ভয়ের কোনও কারণ নাই। তাহারা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া যায়, নিবারণও পচুর বাড়ির পথ ধরে।

কি গো পচু, মেয়ে কেমন আছে ?—পচুর বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া নিবারণ হাঁক দিয়া বলে। পচু ঘরের ভিতরই ছিল। সে আশ্চর্য হইয়া উত্তর দেয়, মাস্টারবাবু না কি ?

হ্যাঁ, আমি।

নিবারণের অপ্রত্যাশিত এই আগমনে পচুর আনন্দের আর সীমা থাকে না। সে প্রায় দৌড়াইয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। বলে, আজ্ঞে, আছে ওই একই রকম—বেহুঁশমত। কথাবার্তা বলে না। ডাক্তারবাবু একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে গেছেন।

কি ইন্‌জেকশন ?

আজ্ঞে, তা তো বলতে পারব না। তবে বললেন—পচু, আর একটু দেরি হ'লে তোমার সর্বনাশ হয়ে যেত। ঘাড়ের কাছটা শক্ত হয়ে গেলে তখন বড় মুশকিল হ'ত।

সর্বনাশ !—চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বলে নিবারণ, মেনিন্‌জাইটিস্ না তো ? কই দেখি, দেখি তোমার মেয়েকে ! বলিতে বলিতে সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে।

কুইনাইন এম্প্যুলের ভাঙা কাঁচটা তখনও মেঝেতে পড়িয়া ছিল। পচুর স্ত্রী ঘোমটা টানিয়া বসিবার জন্য একখানা তালের চাটাই আগাইয়া দেয়। নিবারণ তাহাতে বসিয়া পড়ে।

নয়-দশ বৎসরের মেয়ে। জ্বরে অচৈতন্যের মত পড়িয়া আছে। তালপাতার চাটাইয়ের উপর শতছিন্ন একখানি কাঁথা, শিয়রে তেলচিটে অপরিষ্কার একটি বালিশ, গায়ে অপরিচ্ছন্ন অতি সাধারণ একখানি সুতির কম্বল। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপ মনকে পীড়িত করিয়া তোলে। গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া নিবারণ বলে, জ্বর তো খুব রয়েছে দেখছি ! বোধ হয় এক শো চারের কাছাকাছি হবে। দেখ পচু, আমার মনে হয় মাথায় জল দেওয়া বন্ধ না করাই ভাল। বরফ দিতে পারলে আরও

ভাল হ'ত। যদি জ্বর না কমে তবে বরফ দেওয়া দরকার। তুমি দেড়টা-দুটো অবধি অপেক্ষা কর। এর ভেতর অবস্থা বুঝে ডাক্তারবাবুকে বরফের কথা বলবে। তাঁর মত নিয়ে বিকেলের গাড়ি থেকে বরফ কিনে আনবে, কেমন!

তারপর আশ্বাস দিয়া বলে নিবারণ, ডাক্তারবাবু যখন বলেছেন, তখন আর ভয়ের কোন কারণ নেই। ব্যস্তভাবে উঠিতে উঠিতে বলে, উঠি এখন, ইস্কুলে যেতে হবে। হ্যাঁ, শোন, বিকেলের দিকে আমি মজুমদার-বাড়িতে থাকব। লক্ষ্মী কেমন থাকে আমাকে খবর দিও একবার। বড় চিন্তায় থাকব।

পচু বলে, আচ্ছা।

যাইতে যাইতে নিবারণ ভাবে মজুমদার মহাশয়ের জন্যও সামান্য পরিমাণে বরফ সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার। নতুবা সেই ভোরের ট্রেনের পূর্বে আর তাহা পাওয়া যাইবে না। তাঁহার রক্তের চাপ অত্যন্ত বেশি, ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন। কি জানি, যদি প্রয়োজন হয়—পূর্ব হইতে সাবধান থাকা ভাল। মারাত্মক হইতে কতক্ষণ লাগে! তারপর অনেক কথা ভাবে নিবারণ—লক্ষ্মীর চুলে কতদিন তেল পড়ে নাই, গায়ে এখানে সেখানে ময়লা জমিয়া আছে। হাতে শখ করিয়া দুইখানি কাঁচের চুড়ি পরিয়াছে আবার! পচুর স্বভাব, পচুর স্ত্রীর ঘোমটা ও কপালের সিঁদুরের টিপ, তাহাকে বসিবার জন্য আসন দেওয়া, ঘরের উপরে ঝুল, কোণে লক্ষ্মীর আসন ও পট, আরও কত কি—বিদেশী সমালোচকদিগের দৃষ্টিতে যাহা অর্ধমানবীয় সভ্যতা। দারিদ্র্যের জন্য সে জীবন মনুষ্য-জীবনের মর্যাদা পর্যন্ত পায় নাই।

তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া খাইতে বসে নিবারণ। আসনে বসিয়া সে হাসিয়া ফেলে—ছেলেমানুষের মত খিল খিল করিয়া হাসে। পিসিম

অবাক হইয়া যান। না বুঝিয়া তিনিও ঈষৎ হাসিয়া ফেলেন। বলেন, সে কি রে! কি হ'ল আবার? নিবারণ এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া হাসি থামাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। কৃত্রিম ক্রোধের সহিত পিসিমা বলেন, আ গেল, বিষম লাগবে যে! মাথা-টাতা খারাপ হ'ল নাকি তোর! নিবারণ অতি কষ্টে হাসি থামাইয়া বলে, বুঝলে পিসিমা, নতুন অধ্যায় শুরু হ'ল, নতুন অধ্যায় শুরু হ'ল আবার।

সে কি রে!—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেন পিসিমা।

কি আবার! এই মজুমদার মশায়, শশধরবাবু, নীরু দিদিমা, গঙ্গাধর দত্ত, পচু বাগদী, লক্ষ্মী, ডাক্তারবাবু, জনকপুর—এই সব আর কি! জীবনের নতুন একটা অধ্যায়, বুঝলে না? এক নিশ্বাসে বলে নিবারণ।

ও! আচ্ছা পাগলা তো!—পিসিমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে বলেন, বাঁচলাম বাবা। যা হাসির বহর, আমি ভাবলাম আরও কি না কি! তারপর পিসিমার মুখের ভাব সহসা পরিবর্তিত হইয়া যায়। গম্ভীরভাবে তিনি বলিতে থাকেন, আচ্ছা, তোমার জীবনের অধ্যায়ের তো অন্ত নাই বাছা। সেই তেরো বছর বয়সে পায়ের দফা দিলে শেষ ক'রে! তাই নিয়ে আমার কত না ভোগান্তি! তার পর থেকে কত না অধ্যায় চ'লে গেল তোমার জীবনে। অধ্যায়ে আর কাজ নেই বাপু—এবার ক্ষান্ত দাও। বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখবে—অদৃষ্টে আরও কত কি আছে কে জানে

আরও দেখবে, পিসিমা, আরও দেখবে। আরও আমি দেখাব। আর আমার সবখানি দেখবার জন্যে মায়ের বদলে তুমিই তো আছ।

মায়ের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িলে পিসিমা ব্যথা পান মনে। নিবারণের ব্যথা পিসিমার প্রাণে বাজে। তিনি ইচ্ছা করিয়া কথাটা চাপা দিয়া বলেন, আর দুটি ভাত নে, আর একটু তরকারি দিই? দুই-একটি ডালের বড়ি পাতে দিয়া বলেন, এই নে বড়ি। তুই তো বড়ি খেতে

খুব ভালবাসিস। বড়ির তরকারি দিয়াই সামান্য পরিমাণে ভাত আস্তে আস্তে থালায় ঢালিয়া দেন। নিবারণ 'না' 'না' করিয়াও ভাত কয়টি খাইয়া ফেলে। এমন করিয়া সাধিয়া-দেওয়া ভাতগুলি তাহার নিকট অত্যন্ত সুস্বাদু মনে হয় যেন।

মুখ ধুইবার সময় নিবারণ জিজ্ঞাসা করে, শচীন খেয়ে গিয়েছে তো?

খেতেই তো বলেছিলাম, তা আর হ'ল কোথায়! তুই স্নান করতে যাবার পর নীরু ঠাকরুণ এসে নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে। বললেন—আমার কাছেই খাবে আজ শচীন। তারপর গলার স্বর একটু নীচু করিয়া প্রশ্ন করেন পিসিমা, বুড়ো বাঁচবে তো রে? কেমন মনে হয় তোর?

নিবারণ উত্তর দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁচবে। না বেঁচে যাবে কোথায়! আর দেখ পিসিমা, বুড়োকে বাঁচানো দরকার। আমি বুড়োকে বাঁচাব আমার নিজের প্রয়োজনে। বুড়ো না বাঁচলে আমাকে বুঝবে কে? আমার প্রকাশই হবে না তা হ'লে।

পিসিমা হাসিয়া ফেলেন। বলেন, তোর যত সব হেঁয়ালী আর হাসি। দেখে গা জ্ব'লে যায় আমার। আমি কি অতশত বুঝি রে!

গঙ্গাধর ঘরের ভিতর পা দিতেই অবিনাশ প্রশ্ন করেন, গঙ্গাধর, টেলিগ্রামের রসিদটা কোথায় দেখি! গঙ্গাধর প্রস্তুতই ছিল। জামার বুক-পকেট হইতে রসিদটি বাহির করিয়া দেয়। বৃদ্ধ তাহা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখেন অনেকক্ষণ। তাঁহার আকার-ইঙ্গিতে দৃষ্টিশক্তির কোন বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল হাতটা মাঝে মাঝে একটু কম্পিত হয়।

নীরদা ঠাকুরাণীর সহিত মজুমদার-বাটীতে শচীন এই প্রথম পদার্পণ করিল। নিবারণ বৃদ্ধের নিকট ইস্কুল সংক্রান্ত নানাপ্রকার কাজে এই

বাড়িতে বহুদিন আসিয়াছে; কিন্তু শচীন এই দুই মাসের ভিতর একবারও আসে নাই এখানে, সে সুযোগও তাহার হয় নাই। বাড়িখানির প্রতি তাহার আগ্রহ ছিল প্রচুর এবং সেই জন্যই সে মধ্যে মধ্যে এই দিকে বেড়াইতেও আসিয়াছে। পূর্ববঙ্গ-পরিত্যক্ত দাদাদের সেই গ্রামে এমনই একটি অট্টালিকা আছে, তাহা এখন ভগ্নপ্রায় ও বর্জিত। সে বাড়িটি শচীনের বড় ভাল লাগিত।

প্রকাণ্ড বড় বাড়ি—অতি পুরাতন, আন্দাজ দেড শত বৎসরের হইবে। বোধ হয় অবিনাশের পিতামহের আমলে নির্মিত হইয়াছিল, এখন সকল অংশই একরূপ জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে চূনবালি আস্তরের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। মনে হয় যেন হাল্কা ধরনের নোনা-ধরা ইটগুলি স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে। হঠাৎ লক্ষ্য করিলে একটু দূর হইতে স্তূপ বলিয়াই ভ্রম হয়।

দেউড়ির ফটকটা যেন কোন রকমে মান বাঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মনে হয় যেন কালের উপর ভর করিয়া আছে। না থাকিলে চলে না তাই আছে—এমন একটি ভাব। পাশের ইটের দাঁত-বাহির-করা ফাটলটিতে একটি ছোট অশ্বত্থগাছও জন্মিয়াছে।

দুই দিকে যে কোন এককালে প্রাচীর ছিল তাহা এখনও বেশ বুঝা যায়। মনে হয় কোন না কোন সময়ে এখানেও একটি পুষ্পোদ্যান ছিল।

ফটক সোজাসুজি এক সারিতে পরস্পর-সংলগ্ন চার-পাঁচখানি কোঠাঘর। মাঝখানের ঘরটি বড়—ইহাই বৈঠকখানা। ঘরগুলির সম্মুখে একটানা প্রশস্ত বারান্দা। পূর্বে নাকি দেউড়ি হইতে বৈঠকখানা পর্যন্ত একটি সুরকির লাল রাস্তা ছিল—দুই পার্শ্বে ছিল বিলাতী পামের দুইটি সারি। তন্মধ্যে একটি আজও জীবিত থাকিয়া অপরগুলির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে যেন।

দেউড়ির ভিতর দিয়া দক্ষিণের সর্বশেষ প্রকোষ্ঠটির পার্শ্ব দিয়া একটি পায়ে-চলা রাস্তা তালপুকুরের পাড় পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বাটির সম্মুখভাগ হইতে অবিনাশের কক্ষটি এবং দ্বিতলের অপরাপর ঘরগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল দেখিতে পাওয়া যায় অবিনাশের কক্ষনিম্নস্থ সেই উদ্যানবেষ্টিত ভগ্ন প্রাচীরের সামান্য একটু অংশ। একটি গন্ধরাজ ফুলের গাছ অজস্র পুষ্পসম্ভার লইয়া প্রাচীরের অপর পাশ হইতে রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

বহুদিন পূর্বে এ রাস্তা যে ছিল না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক সময় যে স্থানে প্রবেশ করিতে শঙ্কা হইত—অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই, সে স্থানে কি প্রকারে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার লইয়া এই রাস্তা দেখা দিল তাহা কে বলিবে! কেহ ইচ্ছা করিয়া করে নাই। সকলের অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় ইহা হইবে বলিয়াই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাও নিস্তারিণী গত হইবার পর—তাহার পূর্বে নহে। নিস্তারিণীর জীবদ্দশায় এই অট্টালিকায় কোন বার্ধক্যের লক্ষণই ছিল না।

বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করিলে সর্বাগ্রে বিপরীত দিকের দেওয়ালে স্থাপিত একখানি বৃহৎ অয়েল পেন্টিঙের উপর দৃষ্টি পড়ে। হরিণের সিঙের উপর যত্নের সহিত রক্ষা করা হইয়াছে। অবিনাশের পিতা বিশ্বনাথের প্রতিকৃতি। সুন্দর সৌম্য মূর্তি। চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। বিশ্বনাথ উড়িষ্যার কোন সামন্তরাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। নিম্নে লিখিত আছে—৺বিশ্বনাথ মজুমদার। জন্মসন ১২৪৭ সাল—মৃত্যুসন ১৩০৪ সাল। তাহার পাশের পেন্টিংটি সারদাসুন্দরীর—বিশ্বনাথের সহধর্মিণীর। জন্মসন ১২৫৮ সাল—মৃত্যুসন ১৩০৬ সাল।

শচীন একদৃষ্টিতে ছবিগুলির দিকে তাকাইয়া থাকে। ছবিগুলি দেখিতে তাহার বড় ভাল লাগে। হঠাৎ নীরদা বলিয়া উঠেন, এই

সারদাসুন্দরীই আত্মহত্যা করেছিলেন। আত্মহত্যার কথায় শচীন যেন চমকিয়া উঠে। তাহার মুখ হইতে আপনা-আপনিই বাহির হইয়া যায়, আত্মহত্যা!

হ্যাঁ, আত্মহত্যা। এতদিনেও শোন নি সে কথা?—দিদিমা আশ্চর্য হইয়া শচীনের মুখের দিকে তাকান।

কই, না তো! কিন্তু কেন, দিদিমা?

বলছি, শোন। শচীনকে নীচে রাখিয়া দিদিমা উপরতলায় যান। খোঁজ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলেন, না, ঘুমোচ্ছেন উনি। গঙ্গাধর কাছে আছে। তারপর আরম্ভ করেন, সারদাসুন্দরীর আত্মহত্যার কথা তো? সে কথা এ অঞ্চলে কে না জানে? এখনও কবির দলে, বাউল-ভিখারীর মুখে মুখে গ্রামে গ্রামে চলে এই উপাখ্যান। আগে আরও বেশি চলত। সকলেই শুনেছে মায়ের সেই মর্মন্তুদ কাহিনী। বলছি, শোন।

মা, মা!—ছুটিতে ছুটিতে অন্দরমহলে প্রবেশ করেন অবিনাশ। মা, সর্বনাশ হয়ে গেল আমাদের—কাকা ডিক্রী পেয়ে গেলেন। আমাদের আর কোন আশা ভরসা নেই। উঃ, এতদিন ধ'রে বড় আদালত পর্যন্ত মামলা চালিয়েও শেষে কিনা এই ফল হ'ল! হা ভগবান, বিচার কি আছে তোমার? পৃথিবীতে বিচার ব'লে কোন জিনিস আছে?—মাথাটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মন্দিরের সিঁড়ির উপর অবিনাশ ধপ করিয়া বসিয়া পড়েন।

মা ঠাকুর-মন্দিরের ভিতর পূজায় বসিয়া ছিলেন। ভয়ার্ত ও অস্ফুটস্বরে একবার মাত্র বলিলেন, অ্যাঁ! কি বলছিস অবিনাশ! তারপর নিস্তব্ধ, আর কোন সাড়াশব্দ নাই মায়ের। ব্রাহ্মণঘরের নূতন বিধবা, আচার-বিচারে তখনও নিতান্ত অনভ্যস্তা, উপবাসে আছেন। ইচ্ছা ছিল পূজা শেষ করিয়া একাদশীর পারণ করিবেন।

মা নিশ্চল। সে কি! মায়ের মুখে আর কথা নাই কেন? দেখা গেল, মা মূর্ছা গিয়াছেন। ওই সেই মন্দির, শচীনকে দেখান নীরদা, ওই সেই মন্দির। অন্দরমহলে প্রবেশ করিবার দরজার ফাঁক দিয়া মন্দিরের একাংশ দেখা যাইতেছিল, কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের নামে প্রতিষ্ঠিত। দাশরথি ভট্টাচার্যের পুত্র হিমাংশু ফুলের সাজি হাতে করিয়া তখন মন্দিরের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিল।

এই যাঃ, নৈবেদ্যের থালাটা হবিষ্যি ঘরে প'ড়ে থাকল যে! ছাই, মনেও থাকে না।—ত্রস্তভাবে চলিয়া যান নীরদা। শচীন দেখে থালাটি মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি অতি সন্তর্পণে দ্বিতলে উঠিয়া যান। ফিরিয়া আসিয়া বলেন, দেখে এলাম আবার। কি জানি, বলা যায় না তো। আমার কি ভাই শান্তি-সোয়াস্তি আছে!

জেগেছেন না কি?—প্রশ্ন করে শচীন।

না, এখনও ঘুমোচ্ছেন—একই রকম ভাবে। তা হোক, কি বল? ডাক্তার বলেছে, ঘুম দরকার।

শচীনও যেন একটু নিশ্চিন্ত মনেই বাড়িটি লক্ষ্য করিবার অবসর পায়। দেড় শত বৎসরের সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশা, জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এই অট্টালিকা। ঘটনাগুলি তাহার কানে কানে কি যেন বলিয়া যায়। এমনই একটি জীর্ণ ভগ্ন বৃহৎ অট্টালিকার কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। তাহার নিজের গ্রাম হইতে সাত-আট মাইল দূরে—নিবারণদাদার গ্রামে আছে সেটি। বহুদিন হইল কেহই আর সে বাড়িতে থাকে না, নিঝুম নিস্তব্ধ। বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হইতে বসিয়াছে। লোকে বলে, ভূতুড়ে বাড়ি।

একটি প্রকোষ্ঠে আলমারির মাথার উপর অনেকগুলি হরিণ ও ব্যাঘ্রচর্ম স্থান পাইয়াছে। এক কোণে রহিয়াছে কারুকার্য-করা একটি প্রকাণ্ড তালের পাখা আর কতকগুলি বল্লম, সড়কি প্রভৃতি। ভিতরের

বারান্দার উপর মস্তবড় একটি পালকি অযত্নে পড়িয়া আছে। ঢাল, তলোয়ার, বর্শা সবই আছে সেখানে—পুরাতন আভিজাত্যের নিদর্শন। ঝাড়-লণ্ঠনের ভাঙা টুকরাগুলিতে তুই-তিনটি টিন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইঁদুর-আরসোলার জন্য পরিত্যক্ত ঢাক, ঢোল, তবলার খোল ইত্যাদি আরও কত কি জমা হইয়া চুন-সুরকির গাদার উপর অনাদরে পড়িয়া আছে। বহুদিন হইল তাহাদের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন অবহেলায় দিন গুনিতেছে যেন।

হাঁ, ওই পালকিতে চড়িয়া সারদাসুন্দরী এ গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহারও বারো-তেরো বৎসর পরে আসেন বিরজাবালা—আশুতোষের সহধর্মিণী। বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ সহোদর আশুতোষ। নববধূ নিস্তারিণীও ওই পালকিতে চড়িয়াই মজুমদার-বাটিতে শুভাগমন করেন। কেবল অবিনাশের পুত্রবধূ শশধরের পত্নী স্নেহলতার ভাগ্যে এই পালকিতে চড়া অদ্যাবধি ঘটিয়া উঠে নাই। আজ পর্যন্ত স্নেহলতার সহিত এ গৃহের পরিচয় হয় নাই, তিনি এই স্থানে অপরিচিত রহিয়া গিয়াছেন।

দিদিমা বলেন, অবিনাশের চেয়ে পাচ সাত বছরের পুরনো ওই পালকি। দেখ কেমন নকশা-কাটা, আর মজবুত। আট-আটজন বেহারা লাগত। শচীন পালকিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কিসের যেন স্পর্শ অনুভব করে। নিবিষ্টভাব কাটিয়া গেলে সে বলিয়া উঠে, তারপর দিদিমা, তারপর? শুনতে বড় ভাল লাগে আমার।

তারপর?—দিদিমা শুরু করেন, মায়ের জ্ঞান হ'ল। মা বললেন, কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রে গেছেন কিনা, তারই প্রতিদানটা ভাল ক'রে দিলেন ছোটঠাকুর। ভেবে আর করবে কি, বল!

বিশ্বনাথের প্রায় ষোল বছরের ছোট ছিলেন আশুতোষ। শখ ক'রে বিয়েটাও একটু কম বয়সেই দেন বিশ্বনাথ। বিয়ের পর বেশির ভাগ সময় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন তিনি। এই যে মিরপুর গো,

মিরপুর, নাম শোন নি—তারই জমিদার ছিলেন নরেশকুমার। বিরজা হচ্ছেন তাঁরই একমাত্র মেয়ে। হ্যাঁ, নরেশকুমারকে লোকে বলত ধনকুবের—আর সত্যিই ধনকুবেরই ছিলেন তিনি। আমি এ বাড়িতে প্রথম কখন আসি জান ?

আপনি এ বাড়িতে আসেন মানে ? আপনি এ বাড়ির মেয়ে না ?—শচীন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে।

দিদিমা কৌতুকের সহিত হাসিয়া উত্তর করেন, না না, আমি হচ্ছি মজুমদার মশায়ের স্ত্রী নিস্তারিণীর ছোট বোন। সকলেই এই একই ভুল করে।

তাই নাকি ? আমি ভেবেছিলাম আপনি দাদুর বোন। যাক, তা আপনি প্রথম কবে এসেছিলেন এ বাড়িতে দিদিমা ?

সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে,. এই রকম দোলের সময়টাতে। শশধরের অন্নপ্রাশন হয়েছিল সেবার। বিশ্বনাথ লোক পাঠিয়েছিলেন, আর দিদিও আসতে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে।

নিস্তারিণী যেতে লিখেছে যে!—বাবা বললেন মাকে। মা হেসে বললেন, বেশ তো, যাও না। এবার তো আর যেতে বাধা নেই। আমাদের মায়ের কোলে যখন দাদু এসেছে, তখন আর দোষ কি! দাদুর জন্যে কি নিয়ে যাবে ? বেশ একটু ভাল দেখে কিছু নিও কিন্তু। বাবা দাদা এসেছিলেন—তাঁদের সঙ্গে আমিও এসেছিলাম। আমার তখন এনট্রান্স পরীক্ষাটা হয়ে গিয়েছিল—বেশ মনে আছে। শচীন অবাক হইয়া দিদিমার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি বলিয়া উঠেন, বিশ্বাস করলে না বোধ হয় ; তবে তো সার্টিফিকেটটা দেখাতেই হ'ল। বারোজন মেয়ে পাস করেছিল সেবার।

শচীন বলে, না না, তা নয়। আগেকার দিনের লোক, আশ্চর্য হবার কথা নয় কি ?

তা বটে। এখন শোন।—শচীনের প্রশংসার প্রতি গুরুত্ব না দিয়া দিদিমা বলিয়া যান, ওই যে অতবড় উঠোনটি দেখছ, আর এই আঙিনা, বারান্দা—সব জায়গা ভর্তি হয়ে যায় খাবার আসন আর পাতাতে। এক-একবারে যে এমন কত লোক খেয়েছিল তার হিসেব-নিকেশ নেই, চার-পাঁচ হাজার হবে হয়তো। অমন দশ-বিশখানা গ্রামের লোক—রাত বারোটা অবধি সে কি ঘটা!

বিশ্বনাথ রাজার দেওয়ান ছিলেন—দিলদরিয়া মানুষ। খরচের হাতও ছিল খুব লম্বা আর শরীরের উপর অত্যাচারও করতেন খুব বেশি। একটু-আধটু নেশাটেশাও করতেন বোধ হয়। কুফল ফলতেও দেরি হ'ল না—যকৃতের দোষ দেখা দিল বিশ্বনাথের। চিকিৎসার জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় করতে লাগলেন, কিন্তু ফল হ'ল না। আয়ও তখন আর বিশেষ কিছু ছিল না—শুধু ছিল ব্যয়। বিষয়-আশয় কটবন্ধক দিয়ে ছোট ভাই আশুতোষের শ্বশুর নরেশকুমারের কাছ থেকে টাকা ধার করতে থাকেন। আশুতোষ বারণ করেন নি তখন। বলতেন, দাদার জীবন আগে, তারপর টাকা-পয়সা বিষয়-আশয় আর যা সব।

অবিনাশ কলকাতায় থেকে অল্পদিনের ভিতর চার-পাঁচটা পাস করেন—এম. এ. পর্যন্ত বরাবর বৃত্তি পান। তারপর ওকালতী পরীক্ষায় প্রথম হন। বিশ্বনাথের ইচ্ছা, রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন, কোন কাজে যেন লেগে যান অবিনাশ। রাজার মতও পেয়েছিলেন। কিন্তু মা বললেন, না না, খোকাকে আমি কিছুতেই বিদেশে চাকরি করতে ছেড়ে দিতে পারব না। আমার একমাত্র ছেলে।

অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন অবিনাশ, কত না মেডেল পেয়েছেন! ভাল হ'লে চেয়ে নিয়ে দেখবে একদিন। এই তো, ওই দেখ অবিনাশের লাইব্রেরি। শচীন তাকাইয়া দেখে, একটি ঘরের জানালার ভিতর

দিয়া অনেকগুলি বই-ভর্তি আলমারি দেখা যাইতেছে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে, তার পর দিদিমা ?

কি বলছিলাম ?—একটু থামিয়া চিন্তা করিয়া লইয়া বৃদ্ধা আরম্ভ করেন, ও, হ্যাঁ। অবিনাশ শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই থেকে যান, বিদেশে চাকরি করতে যাওয়া তাঁর আর ঘ'টে উঠল না।

প্রত্যেকদিন মন্দিরে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করতেন বিশ্বনাথ। ক্রমাগত ভুগছেন, শরীরও খুব দুর্বল ছিল। কবরেজ হাঁটাহাটি করতে নিষেধ করেছিলেন। মাও নিষেধ করতেন। তা তিনি কি আর সে সব শোনবার পাত্র! বাড়ি থাকলে বিগ্রহ দর্শন না ক'রে জলগ্রহণ করতেন না। সেদিনও দর্শন ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, এমন সময় কি যে হ'ল—। বৃদ্ধা থামিয়া যান। শচীন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে তিনি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করেন, হঠাৎ কেন যেন প'ড়ে গেলেন তিনি।

তারপর সব শেষ। ওই যে কাঁঠালি-চাঁপার গাছটা দেখছ, ওই জায়গাটাতে তিনি পড়েছিলেন। আর জ্ঞান ফিরে আসে নি। শশধরের অন্নপ্রাশনের ঠিক এক মাস পরেই তিনি মায়ামমতা কাটিয়ে দিয়ে, সকলকে কাঁদিয়ে চ'লে গেলেন। দিদিমার চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠে, তিনি থামিয়া যান। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শচীন অতীতের এই কাহিনী শুনিয়া যায়।

তারপর দিদিমা, তারপর ?

তারপর, যৌথ সম্পত্তির দেনা। আশুতোষ তো কিছুতেই এ দেনার দায়িত্ব স্বীকার করবেন না—কিছুতেই না। মা তাঁর শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে একটা মিটমাট করিয়ে দিতে কত অনুরোধ করলেন, তা কে কার কথা শোনে! শুনলেন না সে কথা। আশুতোষের শ্বশুরই বা কি কম কঞ্জুস ছিলেন, আপোসের পথে কিছুতেই গেলেন না তিনি।

নরেশকুমার মামলা রুজু করলেন, দু-তিন বছর ধ'রে বড় আদালত পর্যন্ত এই জটিল মকদ্দমা চলল।

হেরে গিয়ে আশুতোষকে ডেকে পাঠালেন মা। কিন্তু সেই রাত্রিতেই সব শেষ হয়ে গেল। মায়ের জীবনের শেষদিনের এই গল্প এখনও লোকের মুখে মুখে চ'লে আসছে কত কাল থেকে।

কেন, কেন? কি হয়েছিল সারদাসুন্দরীর?—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে শচীন।

—না না, আমি চুরি করতে আসি নি—চুরি করতে আসি নি, বিশ্বাস কর ছোটঠাকুর। ওই তো তোমার গয়নার বাক্স। সবই রয়েছে ঠিক—খুলে দেখ মিলিয়ে। আশুতোষের সম্মুখে ধরা পড়িয়া যান সারদাসুন্দরী। অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন, যেন কত অপরাধী।

—তবে কেন আপনি আমার ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিলেন, বলুন? এই তো সামান্য সময়, আমি একটু বাইরে বেরিয়েছি অমনি? সুযোগ খুঁজছিলেন বোধ হয়, না? আবার বলছেন, চুরি করতে আসেন নি। তবে কিসের জন্যে এত রাত অবধি জেগে আছেন আপনি? নিশ্চয়ই কোন সৎকাজ করবার জন্যে নয়। ব্যঙ্গের সহিত মুখ বিকৃত করিয়া চীৎকার করিতে থাকেন আশুতোষ।

—কি, আমাকে বিশ্বাস করলে না? আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না? তবে কি—তবে কি চোরই মনে করলে আমাকে? আর তাই জানাচ্ছ সবাইকে, না? না না ছোটঠাকুর, চীৎকার ক'রো না, চীৎকার ক'রো না তুমি। একটু থাম, দোহাই তোমার, একটু আস্তে কথা বল। বলছি, বলছি সব, কেন আমি এসেছি এখানে। মিনতি করছি তোমাকে, আমাকে একটু সময় দাও—আর চুপ কর তুমি।—থরথর করিয়া সারদাসুন্দরী কাঁপিতে থাকেন।

—না না, আমার সে বিশ্বাস নেই। সে বিশ্বাস চ'লে গেছে বহুদিন। ওসব কোন কথা শুনতে চাই না আমি। বল, বত্রিশ হাজার টাকার বদলে আমি তোমাকে হিসাবমত সম্পত্তির কাগজ ফেরত দিয়েছি কি না? বল, দিই নি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছ, কে বলেছে দাও নি? কিন্তু চুপ কর তুমি।

—চুপ করব কেন? আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা? তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে এত বড় সাহস তোমার! কোথায় অবিনাশ, ডাক তাকে।—গর্জিয়া ওঠেন আশুতোষ।

—ওঃ, আমি চোর! আমি চোর! না না না, আমি চোর নই। তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলাম—ভিক্ষা। তাঁর সেই স্মৃতিচিহ্ন, তোমারই তো দাদা।—মা কাঁদিয়া ফেলেন। অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করিয়া আশুতোষ বলেন, মরি মরি, দাদার স্মৃতি এত রাত্রিতে!

—বিশ্বাস করলে না, ছোটঠাকুর? তুমি না তাঁর ছোট ভাই? তোমাকে না তিনি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রে গেছেন! সামান্য সেই আংটিটির জন্যে—আমি কোথায় যাই, আমি কোথায় যাই!—এই না ব'লে দৌড় দিয়ে নীচে নেমে যান। ওই ঘরে ঢুকে দরজা দেন বন্ধ ক'রে। অবিনাশ সেদিন বিকেলে দলিল দস্তাবেজ নিয়ে সদরে উকিলের কাছে চ'লে গিয়েছিল, বাড়িতে ছিল না সে। নিস্তারিণী সবই শুনেছিলেন আড়াল থেকে। নীচের তলায় মুহুরী-কর্মচারীরাও শুনছিল। মার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে নিস্তারিণী নীচে নেমে যান।

শচীন দেখিল, একখানি কামরা—বহুদিন হইতে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হয়, দরজা জানলা বন্ধ। দরজায় একটি পুরাতন তালা ঝুলিতেছে। ভালভাবে লক্ষ্য করিলে মেরামতের চিহ্নগুলি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। দিদিমা শিক্ষিতা—তাঁহার

বর্ণনা শুনিয়া শচীনের মনে হইতে লাগিল যে ঘটনাটি যেন এইমাত্র তাহার চোখের সম্মুখে ঘটিয়া গেল।

দরজা ভেঙে দেখা গেল সব শেষ। সব শেষ হয়ে গেছে মায়ের, সারদাসুন্দরী আত্মহত্যা করেছেন। একটু পরেই কিন্তু আশুতোষকে আর পাওয়া গেল না। গয়নার বাক্স নিয়ে কখন যে তিনি স'রে পড়েছেন, কেউ তা লক্ষ্য করে নি। কে আর করবে বল, মাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। ভোর হ'লে অবিনাশের ঘরে শশধরের মাথার কাছে যে জানলাটা খোলা ছিল, তার নীচেই সেই হীরের আংটিটি পাওয়া যায়। বিশ্বনাথের বিয়ের আংটি—এখনও আছে অবিনাশের বাক্সে। ওই ঘরে তখন থাকতেন অবিনাশ—এ ঘরে নয়।

দক্ষিণ দিকের সর্বশেষ ঘরখানি লক্ষ্য করিয়া দেখান নীরদা ঠাকুরাণী। দোতলায় তিনখানি কামরা পরস্পর-সংলগ্ন। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, একটি ঘরে অবিনাশ শুইয়া আছেন, গঙ্গাধর পাখা হাতে করিয়া তাঁহার মাথার নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া আছে। পায়ের দিকে দেওয়ালের উপর একটি সেতার ঝুলিতেছে, তাহার উপরে একটি ঘড়ি—দেখিয়া মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি অত্যন্ত অপরিসর এবং অন্ধকার। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গন্ধ। দিদিমা শচীনকে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিয়া আসেন। বারান্দায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা বলেন, এ সব ঘরের ভিতর যে যে আসবাবপত্র দেখছ সবই প্রায় বিশ্বনাথের আমলের, কেবল ঘড়িটা ছাড়া। ঘড়ির দিকে লক্ষ্য পড়িতেই নীরদা বলিয়া উঠেন, ওমা, সাড়ে দশটা বেজে গেল যে! গলার স্বর নীচু করিয়া বলেন, নিবারণ ব'লে গেছে হলদে বড়িটা—এই যাঃ, কথায় কথায় ভুলে গেছি সব। আমার কি ছাই—! কথা শেষ না হইতেই শচীন বলিয়া ফেলে, উনি তো ঘুমোচ্ছেন। ঘুম যখন ওঁর দরকার, তখন ভাঙানো

বোধ হয় ঠিক হবে না। থাক্, আপনি ব্যস্ত হবেন না দিদিমা। ঘুম ভাঙলেই খাইয়ে দেওয়া যাবে।

মেহগনী কাঠের টেবিলের সম্মুখে একখানি বেতের চেয়ার। খাটের উপর শুইয়া আছেন অবিনাশ—সুন্দর প্রিয়দর্শন মুখখানি। আকৃতি ঋষিতুল্য—দেখিলে ভক্তি হয়—দীপ্ত এবং প্রশান্ত। শ্বেত শ্মশ্রু মুখখানিতে দার্শনিকের গাম্ভীর্য দান করিয়াছে যেন।

নিস্তারিণীর অয়েল পেন্টিংটি দেওয়ালে প্রলম্বিত রহিয়াছে: জন্মসন ১২৮৪ সাল—মৃত্যুসন ১৩১৫ সাল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় গভীর মমতার সহিত দেখে শচীন। মনে হয়, এই গৃহের পরিবেশ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ধীরে ধীরে নিবারণদাদার সেই গ্রামের রূপটি তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে—প্রায় একই প্রকার। দুই গ্রামের দুই পরিবারের ভিতর কতই না সাদৃশ্য! সে পরিবারের ইতিহাসের সহিত হত্যার এক নিষ্ঠুর কাহিনী জড়িত হইয়া আছে, আর এখানে আছে করুণ আত্মহত্যার। শচীনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

টেবিলের উপর একখানি ইংরাজী খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল এবং তাহার উপর একটি চশমা। শচীনের ভাবুক মনে নূতন চিন্তার স্রোত ছুটিয়া যায়। সে ভাবে, এই সেই টেবিল, যে টেবিলে বিশ্বনাথ হয়তো পড়িয়াছে—কালিদাস, ভবভূতি, শঙ্করাচার্য, বেদের টীকা আর বেদান্তের ভাষ্য, পুরাণ, দর্শন আরও কত কি! সেগুলির কিছু কিছু হয়তো মুদ্রিত, কিছু হয়তো বা হস্তলিখিত বড় বড় অক্ষরে মোটা তুলট কাগজের উপর অথবা তালপাতায়।

তারপর অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। আজ হইতে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে বোধ হয় অপর একজন এই টেবিলে পড়িতে বসে। সে অবিনাশ। পড়ে শেক্সপীয়র মিল্টন শেলী বায়রন কীট্স, দান্তে গ্যেটে ভিক্টর হিউগো। ষ্টীম এঞ্জিন এই যুগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ডারউইন, ওয়ালেস ও হাক্সলী দেখা দিয়াছেন এবং কলিকাতার বন্দরে বাষ্পচালিত জাহাজ বহুপূর্ব হইতেই যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে।

শশধর যে এই টেবিলে বসিয়া পড়িয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের সব জটিল প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন—কল্পনাবর্জিত তথ্যমূলক রচনা। সেই শশধর এখন কলিকাতার একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও ব্যবসায়ী। দর্শন কাব্য ও বিজ্ঞান সে-যুগে তখনও আজিকার মত পৃথকান্ন হইয়া পড়ে নাই। যন্ত্রের যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বটে, যন্ত্রকে মানুষ আশীর্বাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে বটে, তবে যন্ত্র যে সমস্যার জনকরূপে অভিশাপরূপে দেখা দিতে পারে সে চিন্তা মানুষ সেদিন করে নাই। নূতন জিনিস পাইয়া মানুষ ছুটিল—সে কোথায় ছুটিল! হায় রে শিশুর দল! চিন্তাসূত্রটি ছিঁড়িয়া যায় নীরদা ঠাকুরাণীর কথায়—শচীন, ব'স তুমি, কেমন! আমি আবার ভোগ রান্না চাপিয়ে দিয়ে এসেছি, পুড়ে যাবে সব। তুমি ব'স।

কিছুদূর গিয়া বৃদ্ধা ফিরিয়া আসেন, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলেন, তোমাদের পেয়ে আমি কত যে নিশ্চিন্তি হয়েছি তা আর কি বলব! দেখ, সব থাকতেই কেউ নেই, তাই ভগবান তোমাদের জুটিয়ে দিলেন। সবই নারায়ণের কৃপা।—কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরাণীর চোখে জল আসিয়া পড়ে। 'নারায়ণ' 'মধুসূদন' 'নারায়ণ' বলিতে বলিতে তিনি নীচে নামিয়া যান।

আশুতোষের প্রতি শচীনের মন তিক্ততায় ভরিয়া যায়। তাহার মনে হয়, মানুষই সর্বাপেক্ষা হিংস্র জীব। সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনে তাহার ন্যায় বহুপ্রকার জীব পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সে সকল প্রাণীদের সহিত বল ও বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া মানুষ তাহাদিগকে নির্মমভাবে উৎসাদন করিয়াছে। সেই স্বভাব তাহার পরিবর্তিত হয় নাই, বোধ হয় হইবেও না। বানর প্রভৃতি তো তাহার পূর্বপুরুষ নহে—

পূর্বপুরুষের সমসাময়িক অপরাপর গোষ্ঠীসমূহের বংশধর মাত্র। সত্যই মানুষের হিংস্রস্বভাব এখন ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাহাও বোধ করি বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। নিবারণের কথাগুলি শচীনের মনে পড়িয়া যায়। দাদা একদিন বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর প্রতিটি স্থানই জীবন-বিকাশের পক্ষে সমান সহায়ক নহে, বুদ্ধিবৃত্তি স্ফুরণের জন্যও নহে। সামান্য দুই-চারি লক্ষ অথবা দুই-চারি কোটি বৎসর অগ্র-পশ্চাতে সৃষ্টির কতকগুলি অর্থপূর্ণ মুহূর্তে বিভিন্ন স্থানে পরস্পর হইতে স্বাধীনভাবে জাত বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী আজ বিভিন্ন জাতি নামে পরিচিত—বিভক্ত। মিশ্রিতও বটে, আবার মিশ্রণ-বিরোধীও বটে। দ্বন্দ্ব কলহ যুদ্ধাদিতে যখন প্রবৃত্ত হয়, জাতি-নির্বিশেষে তখন এই কথা বলে যে, ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহারা যুদ্ধ করিতেছে, মানুষকে বাঁচাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে—সভ্যতার অগ্রগতির জন্য, জীবন রক্ষার জন্য ধ্বংসেরও প্রয়োজন আছে, কী আশ্চর্য! এক সমাজ অপর সমাজকে যখন স্বীকার করে না তখন কি করিয়া তাহারা গর্ব করিয়া বলে, আমরা ভালভাবে শান্তিতে বাঁচিব—মানুষের ন্যায় বাঁচিব? হায় রে মানুষ!

মনুষ্যজাতির প্রতি ধিক্কারে শচীনের মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। আশুতোষের কথাগুলি সে যেন ভুলিতে পারে না। বিশ্বনাথের পীড়িত অবস্থাতে আশুতোষ বলিয়াছিলেন, দাদার জীবনের নিকট অর্থ, বিষয় সম্পদ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং মূল্যহীন। ভ্রাতার উপযুক্ত কথাগুলি বটে। কিন্তু সেই আশুতোষ, যে আশুতোষ বিশ্বনাথের স্নেহে-যত্নে বর্ধিত লালিত-পালিত, সে কেন এত সব বিত্ত ঐশ্বর্য থাকিতেও তাহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেল, ভ্রাতৃবধূকে নির্দয়ভাবে অবিশ্বাস এবং অপমান করিল? ধিক্ মানুষকে! জেকিল ও হাইডরূপী মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধায় শচীনের মন ভরিয়া উঠে।

অবিনাশ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠেন। মুখে একটা প্রশান্তির লক্ষণ নামিয়া আসিয়াছে। শচীনকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া স্নেহের সহিত হাতখানি বাড়াইয়া দেন বৃদ্ধ। শচীন তাঁহার নিকট গিয়া বসে।

একটা হলদে বড়ি খেতে হবে যে।—শচীন বলে।

হ্যাঁ, দাও।

গঙ্গাধর আনন্দিতভাবে বলে, কর্তা প্রায় এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন শচীন-বাবু। ওষুধে বেশ কাজ হচ্ছে।

ইংরাজীর ক্লাসে পড়াইতেছিল নিবারণ—সেলফিস জায়াণ্ট, স্বার্থপর দৈত্য। তাহার বাচনভঙ্গী অপূর্ব। ছাত্র সকলেই বালক—বারো তেরো হইতে পনের যোল বৎসর পর্যন্ত বয়স এক-একজনের বোধ হয়।

হাঁ, শোন। ইহা মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস। মানুষের ভিতর স্বার্থপরতার নীচতার দৈত্য যেমন আছে, তেমনই মনের প্রসারতা উদারতা ও জ্ঞানের দেবতাও বাস করে সেখানে। আমরা যখন স্বার্থযুক্ত হই, নীচতা যখন আমাদের মধ্যে দেখা দেয়, তখন অপরকে বঞ্চিত করি আমরা, আর তাহার সহিত নিজেরাও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হই। প্রেম দ্বারা, স্নেহ দ্বারা, প্রীতি করুণার দ্বারা মানুষকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে,—মানুষকে ভালবাসিতে হইবে। শুধু মুখে ভালবাসার কথা বলিলে চলিবে না; তাহার জন্য কাজ করিতে হইবে। তবেই স্বার্থপরতার দৈত্য প্রেমের কাছে পরাভব স্বীকার করিবে, হার স্বীকার করিবে। জগৎ তাহার নিকট কত বড়—কত বিরাট হইয়া দেখা দিবে। সকলেই হইবে তাহার আত্মীয়, তাহার আপনার জন। সকলের জন্য কাজ করিয়া, সকলের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়াতে আনন্দ।

নিজেকে ভুলিয়া যাও। নিজেকে যখন বিচার করিবে তখন সকলের সহিত একসঙ্গে বিচার করিও—নিজেকে পৃথকভাবে নহে। নিজেকে

অপর অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিও না। নিজেকে অহেতুক বেশি বড় করিতে গেলে অপরকে বঞ্চিত করিতে হয়, এ কথা মনে রাখিও। মনের সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর ভাঙিয়া ফেল—

নিবারণ হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। ছাত্রেরা হয়তো বা তাহার কথাগুলি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিতেছে না ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করে, দৈত্য যদি প্রাচীরটা না ভেঙে ফেলে মনে মনে শুধু দুঃখই করতে থাকত, আর বলত, হায় হায়, আমি কি ভুলই করেছি, ভুল হয়ে গেছে আমার। মুখে এই বলত আর খোকাখুকুদের ডাকত, তবে কি তারা দৈত্যের কাছে যেত ?

একজন উত্তর দেয়, না।

ঠিকই বলেছ তুমি।—বলে নিবারণ, কাজ করতে হবে, তবেই সত্যিকারের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কাজ ক'রে দেখিয়ে দিতে হয়, শুধু ফাঁকা কথায় কাজ হয় না। আর কাজ হ'লেই মনের পরিবর্তনের প্রকৃত সার্থকতা। কেমন, বুঝলে সব, বুঝতে পেরেছ ? বেশ।

ঘণ্টা পড়িয়া যায়। অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবিতে ভাবিতে নিবারণ লাইব্রেরির দিকে যায়। খঞ্জ নিবারণ।

পরবর্তী ঘণ্টা বিশ্রামের। লাইব্রেরির ভিতর প্রবেশ করিতেই শিক্ষকগণ সকলেই সেক্রেটারি মজুমদার মহাশয়ের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করেন। বলেন, ছুটির পরে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন। নিবারণের নিকট তাঁহাদের কথাবার্তাগুলি কেমন যেন প্রাণহীন ও আন্তরিকতাশূন্য বলিয়া মনে হয়। তাহার যেন মনে হয়, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি মানুষের মনকে সমৃদ্ধ করিবার পরিবর্তে তাহাকে কৃত্রিমতা দ্বারা দরিদ্র করিয়া তুলিয়াছে। মনের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে নিবারণ। একটু নির্জন স্থান দেখিয়া সেখানে বসিয়া পড়ে।

পাকা রাস্তাটি দেখা যাইতেছে—জনকপুর হইতে মাঠের মধ্য দিয়া মহকুমা শহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। অবিরাম জনস্রোত চলিয়াছে।

প্রতিটি মানুষের সহিত শত সহস্র চিন্তা ভীড় করিয়া চলিতেছে যেন। চিন্তা মানুষকে ছুটাইতেছে। তাহাদের ক্লান্তিহীন অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি কোন এক বিশেষ স্তরে তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছে যেন।

ওই যে বৃদ্ধ—উহার তো এখন বিশ্রামের সময়। বিবর্ণ শুষ্ক মুখ। এই কঠোর রৌদ্রের ভিতর মাথায় ভার বহিয়া শ্রান্তপদে দেহটিকে টানিয়া চলিয়াছে। পায়ের ধুলা দেখিয়া মনে হয় বহুদূর হইতে সে আসিয়াছিল, হয়তো বা স্নেহাস্পদদিগের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের জন্য সামগ্রী লইয়া ছুটিয়াছে ওই। আবার ইহাও হইতে পারে যে সে তাহার ব্যর্থ জীবনের কথা ভাবিতেছে, অসম্ভব কে বলিবে! রোগ শোক অভাব অনটনের সম্মুখীন হইবার জন্য সাহস যে সঞ্চয় করিতেছে না, তাহাই বা কে বলিবে! কে বলিবে কি সে চিন্তা! কিন্তু বার্ধক্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াও কি সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত? না, সে তো প্রস্তুত নহে। কেন? ভাবে নিবারণ। জীবন ভরিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি চলে মানুষের, তবু মৃত্যু যখন আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন মানুষ তাহাকে বলে—একটু দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা কর। কিন্তু কেন? কেন মানুষ মৃত্যুর অবসর পায় না? এই যে সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু, তাহাকে কেন এত অনিচ্ছার সহিত পরের মত গ্রহণ করিতে হয়? বোধ হয় মানুষের দৃষ্টি জীবনের উপর নিবদ্ধ থাকে—মৃত্যু উপলক্ষ্যের মত মনের এক কোণে পড়িয়া থাকে। জীবন উপলক্ষ্য হইয়া মৃত্যু লক্ষ্য হইলে মানুষের ইতিহাস ভিন্ন প্রকারের হইত সন্দেহ নাই। ওই তো, ওই যে একটি বালক ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনের উচ্ছ্বাসে ভরপুর। সকলের পূর্বে পৌঁছিবার কথা ভাবিতেছে হয়তো। ভাবিতেছে, বড় হইয়া সকলের পুরোভাগে নিজের স্থান করিয়া লইবে সে। হায় রে মানুষ! প্রতি মুহূর্তে চিন্তা—জয়ের চিন্তা, এই পৃথিবীতে কোন না কোন নিদর্শন রাখিয়া যাইবার চিন্তা। সংকোচন ও প্রসারণের চিন্তা, সমস্যার চিন্তা,

সমাধানের চিন্তা। সমাধান করিতে বসিয়া নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি ও তাহার জন্য চিন্তা।

নির্দয় অবাধ্য অসংযত প্রকৃতি। সে কেন এত অধিক সংখ্যক মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিতেছে? কেনই বা তাহার এই স্বেচ্ছাচারিতা? মানুষ যেন সমস্যার হাত ধরিয়া দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মানুষ কমিলে বোধ হয় সমস্যাও কমিত, কিন্তু মানুষ তো কমিবে না এখন। এখন যে তাহার অভিযানের বিজয়পর্ব চলিতেছে, প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছে সে—তাহার গোপন রহস্যগুলি আজ মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতি তো নির্জীব অসহায়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। সেও সকলের অলক্ষ্যে প্রস্তুত হইতেছে। তাহার সমতা ও বিধান ঠিক রাখিতে হইবে যে। তাহার সহিত সংঘর্ষে মানুষের ভিতর নিত্য নূতন পশুত্ব যাহাতে দেখা দেয়, তাহার জন্য তাহার প্রচেষ্টার বিরাম নাই, সে সফলকামও যে না হইতেছে তাহা নহে। অদূরভবিষ্যতে এমন একদিন হয়তো আসিবে যখন মানুষই মানুষের সাধনলব্ধ এই সভ্যতাকে ধ্বংস করিবে। সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃতি হয়তো সেদিন তৃপ্তি এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। সেদিন আর মানুষের ফিরিবার পথ থাকিবে না।

নানাপ্রকার অসংলগ্ন চিন্তা করিতে থাকে নিবারণ। সে ভাবে, এমন একদিনও হয়তো আসিতে পারে যেদিন মানুষ বন্ধ্যাত্বের সহিত সংগ্রাম করিবে, একজন নূতন মানুষকে পাইবার জন্য তাহার ভিতর কতই না আকুলতা দেখা দিবে! বন্ধ্যাত্ব সেদিন মানবসমাজে সমস্যার আকারে দেখা দিবে।

আচ্ছা, সমস্যা-সমাধানের চিন্তাও তো কিছু কম করা হয় নাই। দৈহিক মানসিক সংঘর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া মানুষ সৃষ্টিও তো কম করে নাই। মানুষের অন্তরের ব্যথা বেদনা

মানুষকে পথ দেখাইয়াছে শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে। অন্তরের মহৎ প্রেরণাগুলির পরিবর্তে দেহজাত কামনা দ্বারা চালিত হইয়া সে বোধ হয় সমস্যাগুলি আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। অর্ধসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ধর্মের নামে ভণ্ডামি করিয়াছে। বোধ হয় তাহাই। কিন্তু তাহার কি দোষ—সে যে মানুষ।

সত্যই মানুষ কত মহান, কত সুন্দর! মানুষের তুলনা নাই। তাহার মনোরাজ্যে যে দ্বন্দ্ব, যে মন্থন-আলোড়ন চলে তাহা হইতেই সৃষ্টির অমৃত অহর্নিশি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, আর এই অমৃতই সৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—তাহাকে সঞ্জীবিত করিতেছে। হলাহলও উঠিতেছে। সেই হলাহলকে পরিশুদ্ধ করিয়া, অকল্যাণের বীভৎস রূপকে সংযত করিয়া সৃষ্টিকে অধিকতর বলশালী করিবার চেষ্টা করিতেছে সে। কিন্তু দুঃখ ইহাই যে মানুষ তাহার কীর্তি দেখিবার জন্য থাকিয়া যায় না—শুধু এক ধারাবাহিকতা রাখিয়া যায়। সে ধারাবাহিকতা মানুষ হইতে স্বাধীন। ওই যে পথ—কত মানুষের পদচিহ্নই না পড়িয়াছে উহাতে, ওই রাস্তাতে কিন্তু মানুষ নাই। কালসমুদ্রের উপর দিয়া সৃষ্টি জীবনরজ্জুকে অবলম্বন করিয়া এক অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে। খণ্ড খণ্ড রূপে সে পথের কোন অস্তিত্ব নাই, সামগ্রিক রূপ ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সে সৃষ্টির কল্পনাও চলে না। ধারাবাহিকতার এক বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়া তাহার পরিচয়।

আহা, গাড়োয়ান গরুটিকে কিরূপ নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে দেখ। অত্যধিক পরিশ্রমে হয়তো সে মানসিক স্থৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু অতিরিক্ত ভার চাপাইলে গরুটাই বা চলিবে কি করিয়া? ক্রোধে আচ্ছন্ন—বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এখন তাই, নতুবা ঘরে কত সময় সে যে উহার সর্বাঙ্গে আদর করিয়া হাত বুলাইয়া দিয়াছে, মশামাছি তাড়াইয়া দিয়াছে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই।

চিন্তা করিতে করিতে নিবারণ ভ্রূকুটি করে, তাহার মুখের ভাব যেন দৃঢ় হইয়া উঠে। মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি টেবিলের উপর রাখিয়া ভাবিতে থাকে—ক্লান্তি শ্রান্তি বিসর্জন দিয়া অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত আমাকে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সমস্যা না থাকে এবং সমস্যার জন্ম আর না হয়, অবিচার এই পৃথিবী হইতে লোপ পায়। প্রত্যেকটি অন্যায়ের কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, আর কারণগুলিকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে সদাসর্বদা যেন মানুষ আর কখনও মানুষের প্রতি অন্যায়, জীবের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করিতে পারে। সুস্থ সবল সমাজের শান্ত রূপ নিবারণের মানসচক্ষুতে যেন ধীরে ধীরে ফুটিয়া ওঠে।

হেডমাস্টার মহাশয় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে নিবারণের মগ্ন ভাব কাটিয়া যায়। একটু গলা খাঁকারি দিয়া মাস্টার মহাশয় বলেন, বেশ লাগল নিবারণবাবু, আজ আপনার পড়ানোটা বেশ লাগল আমার কাছে। একটু থামিয়া চশমার পাশ দিয়া আড়চোখে তাকান একবার, তারপর বলেন, কিন্তু ছেলেদের পক্ষে একটু কঠিন—

কথা শেষ করিতে না দিয়া নিবারণ বলিয়া উঠে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটু কঠিন হয়েছে, আরও একটু সহজ সরল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

হ্যাঁ, আর একটু সহজভাবে।—অফিসের দিকে চলিয়া যান মাস্টার মহাশয়। কথাগুলি যেন একরূপ কর্তৃত্বসূচক। নিবারণের বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, হেডমাস্টার ক্লাসের বাহির হইতে তাহার শিক্ষা দিবার পদ্ধতিটা লক্ষ্য করিয়াছেন। মনে মনে হাসে নিবারণ। সহজ শান্তভাবেই সে উপদেশটি গ্রহণ করে। তাহার আর কোন ক্ষোভ নাই, কোন খেদই নাই। একদিন চিত্তের এইরূপ গম্ভীর স্থিরতা হয়তো তাহার ছিল না।

যুগপৎ মনে পড়িয়া যায় মাত্র তিন বৎসর পূর্বেকার এক ঘটনার

কথা। তাহার গ্রামের নিকটবর্তী কোন ইস্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় তাহাকে এইরূপভাবে উপদেশ দিলে, সেই উপদেশকে অযাচিত মনে করিয়া সে তৎক্ষণাৎ চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিল। নিদারুণ অপমানে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল। পিসিমা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, স্বাধীন ব্যবসা করছিলে, ছেড়ে দিয়ে গোলামি করতে যাওয়া কেন বাবা? এই তো সুতো-কাপড়ের ব্যবসাতে কি মন্দ পেয়েছ? কেবল খেয়ালমাফিক চল, যখন যে ঝোঁক। বল, ছেড়ে দিয়ে কি ফল হ'ল? কিছু না কিছু হ'ত—আর একদম স্বাধীন, বলতে কইতে কেউ নেই। লোকে বলে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। ব্যবসা থাকতে পরের কথা শুনতে যাওয়া কেন বাপু? সেই রকম ছোটখাট একটা আবার না হয় আরম্ভ কর।—আর আজ?

হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলে নিবারণ। চমকিয়া উঠিয়া ভাবে, সে যে ইস্কুলে আছে—শিক্ষক সে।

কে যায়, পচু না? হাঁ, পচুই তো বটে। কাহার প্রতি যেন কটূক্তি বর্ষণ করিতে করিতে পচু হাসপাতালের দিকে চলিয়াছে। ভাষাটা যেন একটু অশ্লীল। পচু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছে দেখা যায়।

নিবারণ বাহির হইয়া যায়। বারান্দার এক কোণে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলে, পচু, ও পচু, শোন। এই যে, এই দিকে, শোন। নিবারণকে দেখিতে পাইয়া পচুর রাগ যেন শতগুণে বাড়িয়া যায়, উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিতে করিতে নিবারণের দিকে ছুটিয়া আসে—শালীকে আজ শেষ করেছি মাস্টারবাবু, শালীকে আজ শেষ করেছি। মারব না! সোহাগ করব ওকে! না মারলে কি জ্ঞান হয় কখনও!

নিবারণ বাধা দিয়া বলে, আঃ, থাম না, থাম। কি হয়েছে ধীরে সুস্থে বল না ভদ্রভাবে। পচু সে আদেশ উপেক্ষা করিতে পারে না।

সামান্য একটু সংযত হইয়া সে বলিতে থাকে,—আজ্ঞে, এই দেখুন দিকি, মেয়েমানুষের আক্কেলটা! বলি, ছেলেপুলে কি আর কারও নেই নাকি? আদর ক'রে ভাত খাইয়ে দিয়েছে মাস্টারমশায়! অসুখে ভুগছে আজ কদিন ধ'রে, তবুও ভাত খাইয়ে দিয়েছে।—বলিতে বলিতে পচুর গলার স্বর আবার উঁচুতে উঠিয়া যায়। চোখ বড় বড় করিয়া সে হাঁপাইতে থাকে।

ব্যাপারটা বুঝিতে নিবারণের দেরি হয় না। সে হাত তুলিয়া পচুকে থামিতে বলে। ইস্কুলের অফিস-ঘরের দিকে সঙ্কেত করিয়া দেখাইয়া পচুকে সাবধান করে, বিস্ময়ের ভান করিয়া বলে, ভাত? ভাত খাইয়ে দিয়েছে নাকি?

আজ্ঞে, ভাত। সেই না আপনি দেখে এলেন বাবু! তার একটু পরেই আমি গেছলাম বাঁশঝাড়ে বাঁশ কাটতে ঝুড়ি তৈরির জন্যে—খেয়ে বাঁচতে হবে তো, মেয়ে নিয়ে সব সময় ব'সে থাকলেই তো চলবে না। ওরই ভেতরে জেগেছে মেয়েটা। জেগে একটু বায়না ধরেছে না কি করেছে, বলেছে—আমার খিদে পেয়েছে; মা, খেতে দাও। ও কি? বার্লি? না না, বার্লি আমি কিছুতেই খাব না, ভাত খাব আমি। কান্নাকাটি করেছে। বাস্, অমনি ভাত খেতে দিয়েছে ওই রোগা মেয়েকে। দেখুন দিকি আক্কেল আমি কি করি বলুন তো মাস্টারবাবু, আমি কি করি? এদিকে জ্বর একটুও কমে নি। কপালে করাঘাত করিয়া পচু এক রকম আর্তনাদ করিয়া উঠে, ওই মাগীই মেয়েটাকে মেরে ফেলল, মাস্টারবাবু, ওই মেরে ফেলল। বলিতে বলিতে পচুর চোখে মুখে হিংস্রভাব ফুটিয়া উঠে, ক্ষিপ্তের মত বলিয়া চলে, ওকে মারব না? মেয়ের কিছু হ'লে ওকে কেটে ফেলব আমি। হাত দিয়া বাতাসের ভিতর কোপ দিয়া দেখায়। তাহার মানসিক অবস্থা আজ ভোরবেলা হইতেই অত্যন্ত খারাপ যাইতেছিল। একটু

থামিয়া বলে, জিজ্ঞাসা করলাম—দিলি কেন? বললে—আহা, আজ চার পাঁচ দিন জ্বর, মুখ শুকিয়ে গেছে, তাই না দিয়ে পারলাম না।—মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গী করিয়া বলে পচু, আর কারও মা নেই যেন, ওই এক মা জুটেছে পৃথিবীতে!

থাক্, থাক্, যা হবার হয়েছে। ছিঃ, আর মারধোর ক'রো না পচু!—নিবারণ অনুরোধ করিয়া বলে, কি বলছিলে? জ্বর তা হ'লে কমে নি? তবে আর দেরি ক'রো না তুমি। যাও ডাক্তারবাবুর কাছে। ইন্‌জেকশন তো তিন ঘণ্টা হ'ল প্রায়। হ্যাঁ, দেখ পচু, বরফের কথাটা তাঁকে ব'লো, কেমন! তারপর গলার স্বর নরম করিয়া বলে, ছিঃ ছিঃ, মেয়েমানুষের গায়ে কখনো হাত তুলতে আছে? না না, ভাত-টাত কিছু নয়—ওতে ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি যাও, আমি পরে খোঁজ নেব।

পচু অনেকখানি শান্ত হইয়া চলিয়া যায়। যাইতে যাইতে ভাবে নবাগত এই ভদ্রলোকটির কথাবার্তা কেমন সুন্দর! মন কত সরল, একটুও অহঙ্কার নাই যেন! তা আর হবে না কেন, বনিয়াদী বংশের ছেলে কিনা, তাই না এমন!

অবিনাশ বড়ি খাইলেন। গঙ্গাধর শচীনের দিকে তাকাইয়া সঙ্কোচের সহিত বলে, আমার একটু কাজ বাকি আছে। আমি নীচেই আছি।

আচ্ছা যান, আমি তো আছি।—অনুমতি দেয় শচীন। মাথার দিকে টেবিলটার উপর ঔষধ, পথ্য, জল এবং ব্যবস্থাপত্রটি ছিল। শচীন কাগজখানি লইয়া নাড়াচাড়া করে। বিকালের দিকে একটা ইন্‌জেকশন দিতে হইবে যে।

মতির মা এক বালতি জল দরজার পাশে রাখিয়া যায়। ডাবের জল খাইবার সময় হওয়াতে শচীন বৃদ্ধকে ডাব খাইতে দেয়।

মুখ মুছাইয়া দিবার পর ঈষৎ হাসিয়া অবিনাশ বলেন, তোমার নামটা তো আমি মনে করতে পারছি না।

শচীন তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়, আমার নাম? আমার নাম শচীন্দ্রকুমার মিত্র।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শচীন—শচীনই বটে, নিবারণ তাই বলছিল, কিন্তু মিত্র? মিত্র কেন? অবিশ্বাসের সহিত অবিনাশ শচীন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। শচীন মাথাটা নীচু করিয়া বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, মিত্রই।

তুমি না নিবারণ চক্রবর্তীর ভাই?

আজ্ঞে, সহোদর নই—এই যা প্রভেদ।

ও, যাক গে যাক। তা হ'লে, শচীন, তুমি এখন কি করছ? শুনেছি তুমি নাকি ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছ বি. এ. পরীক্ষাতে?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।—বিনীতভাবে উত্তর দেয় শচীন।

এখন কি করছ?

বিশেষ কিছুই না। পড়ছি কিছু কিছু। দাদা বলেন আই. এ. এস. পরীক্ষা দিতে।

কেন? এম. এ.টা শেষ করছ না যে?

দাদার জন্যেই হচ্ছে না। দাদা তো স্থায়ীভাবে এখনও কোথাও বসতে পারেন নি, তবে আর কি ক'রে হবে বলুন? একটা বছর তো পাকিস্তানে নষ্ট হয়ে গেল।—একটু থামিয়া শচীন বলে, দাদার কথা আপনি বোধ হয় সব জানেন না। বলব?

বৃদ্ধ একটু গলা খাঁকারি দিয়া বলেন, বল।

পাকিস্তান থেকে কিছুতেই আসবেন না দাদা। বলেন—না না, অনেক ভাল মানুষ আছে এখানে। সব চ'লে যেতে পারে, আমি

যাব না কিছুতেই। ওরা পাকিস্তান চেয়েছিল, পেয়েছে। বেশ তো, আজ যদি একটু দূরে স'রে যেতে চায়—অবিশ্বাস করে, যাক না কেন? ওরাও তো মানুষ। যে নামেই ডাক না কেন, যে ভাষাতেই কথা বল না কেন, মানুষের জীবনের সার্থকতা ভালভাবে বাঁচাতে, বাঁচতে দেওয়াতে আর ভালভাবে মরতে পারাতে। ওরা যা চেয়েছে তা পেয়েছে দেখে আমি সুখী হয়েছি। তবে, জান কি শচীন, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—যুক্তি, বিজ্ঞান ও অ্যাটমের এই যুগে এই সব ধর্ম নিয়ে, সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ফাটাফাটি কেমন যেন আমার ভাল লাগে না, খাপছাড়াও লাগে। আমার চিন্তা করতে কষ্ট বোধ হয়। মনে হয়, মানুষ কত পিছিয়ে আছে এখনও একদিকে, তার অগ্রগতির বিজয়নিশান উড়ছে! আশ্চর্য! তবুও ধর্মের কথাটুকু বাদ দিলে আমিও ওদের সঙ্গে কাজে লেগে যেতে পারি। আর দেখ, আমি বলছি, ওরা ভুল বুঝবে একদিন, ওরা নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে। ভুল করেছে ব'লে ঘৃণা ক'রে দূরে সরিয়ে দিও না যেন। ভালবাসতে চেষ্টা কর শচীন। ভালবাসাতে ভালবাসার জন্ম হয়। ভালবাসার সোনার কাঠির স্পর্শে ঘৃণা দ্বিধা, মান অপমান, অভিমান সব দূর হয়ে যায়। ঘৃণাতে সমস্যা বেড়ে যায়। ঘৃণার পাপচক্রে ফেলে ঘৃণাই বৃদ্ধি পায়, দাহজ্বালাতে মন পুড়ে ছাই হয়ে যায়—

কথাগুলি শুনিতে বৃদ্ধের যেন ভাল লাগে। শচীন থামিতেই তিনি বলিয়া উঠেন, তারপর?

কিন্তু সেই তো আসতে হ'ল দু বছর যেতে না যেতেই।

ও, তা হ'লে তোমরা বেশিদিন কলকাতায় ছিলে না।

না, এই জানুয়ারিতেই না এসেছি আমরা; মাত্র পনের দিন ছিলাম কলকাতায়। তারপরই তো আপনার ইস্কুল থেকে ডেকে পাঠান দাদাকে।

তোমাদের আসতে কি খুব কষ্ট হয়েছিল? শুনছি অনেকে নাকি খুব কষ্ট পেয়েছে, সত্যি না কি?

না, আমাদের আসতে বেশি কষ্ট পেতে হয় নি, অনেকে পেয়েছে সত্যি। দাদার যা কিছু টাকা পয়সা কলকাতার ব্যাঙ্কেই ছিল। জিন্না ফাণ্ড না-কি একটা ফাণ্ড—সেই যে খুব একটা হৈ-চৈ উঠেছিল—সেই ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে ওয়াগন যোগাড় করলেন দাদা। তাতে থাকে গরু। বললেন, আমি যাব চ'লে, আর ওদের ফেলে যাব—এ হতেই পারে না। শালগ্রামশিলা নিজের সঙ্গে বুকের মধ্যে ক'রে নিয়ে এলেন। গরুগুলি কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়িতে রয়েছে এখন। বলেন, ওদের দুধ খেয়ে বেঁচেছি, ভুলতে পারব না ওদের।

শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধের চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠে, অভিভূতের ন্যায় তাকাইয়া থাকেন। শচীন কথা বলা বন্ধ করে।

কিন্তু আসতে হ'ল কেন?—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করেন অবিনাশ।

কেন? শুনুন তবে। কালীগঞ্জের ঘাটে এল এক বিহারী বাস্তুত্যাগীর দল—ভরা ভাদ্রে নৌকো ক'রে। থাকবার জায়গা নেই। সার্কেল অফিসার দাদাকে ডেকে বললেন—নিবারণবাবু, দেখছেন তো এদের কষ্ট; কোথায় থাকতে জায়গা দিই বলুন? আপনার অতবড় একটা বাড়ি—অনেক ঘরই তো খালি প'ড়ে রয়েছে, দিন না বাইরের ঘরটা ছেড়ে, এদের কাউকে ঢুকিয়ে দিই ওখানে। দাদাও রাজী হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে। পিসিমা শুনে খুব রাগ করলেন, বললেন—এ তোমার ভয়ানক অন্যায় নিবারণ। আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে না! কি না কি সব অখাদ্য কুখাদ্য খাবে! এবার পূজো ভোগ সব বন্ধ হয়ে যাবে দেখো। দাদা আশ্বাস দিয়া বলেন—না না, কিছুই বন্ধ হবে না, ভাবতে হবে না আপনার। কি করি বলুন, ঐ যে দেখুন না, দেখুন না ওই দিকে

তাকিয়ে—ওই যে বাচ্চা ছেলেটি, ও নাকি আজ দুদিন ধ'রে একটু দুধ খেতে পায় নি! কত কষ্ট দেখুন দেখি! ধর্মের আর খাদ্যের কথা বলছেন, ও তো সকলের ঘরোয়া ব্যাপার। ছেলেটির জন্যে দাদা দুধ পাঠিয়ে দেন। পিসিমা দেখে বলেন—তোমার যত সব বাড়াবাড়ি। তেলে-বেগুনে জ্ব'লে ওঠেন পিসিমা।

মাংস তো দূরের কথা, মাছ পর্যন্ত খাও না তুমি। তুমি বরদাস্ত করবে কি ক'রে শুনি?—তীক্ষ্ণস্বরে পিসিমা বলেন—আজ খুব দরদ দেখাচ্ছ, মজা দেখতে পাবে পরে। অবিচলিতভাবে দাদা উত্তর দেন—হ্যাঁ, আমি মাছ মাংস খাই না তা ঠিক, কিন্তু এই শচীন যে খায় তার জন্যে আমি শচীনকে ঘৃণা করি বুঝি? আমার সাধনা জীবন গঠনের, জীবনের পূজায় আমার তৃপ্তি। জীবনবৃদ্ধির স্বপ্ন আমি দেখি। জীবনকে সাহায্য করবার জন্যে জীবনকে নষ্ট করবার কথা কল্পনাও করতে পারি না আমি। আর হত্যার কথা যদি বলতে হয়, তবে হত্যা তো আমরা ক'রেই চলেছি জ্ঞানে আর অজ্ঞানে। কিন্তু যে হত্যাতে আর্তনাদ আছে, বিভীষিকা আছে—প্রাণে সাড়া দেয়, সেই হত্যা থেকে আমি জীবনীশক্তি কেমন ক'রে পাব তা আমি বুঝতে পারি না। এ যেন শ্মশানের উপর প্রমোদ অট্টালিকা তৈরি করবার মত এক অর্থহীন খেয়াল মাত্র। দাদা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পিসিমা প্রমাদ বুঝে চুপ ক'রে যান। বেশি না ঘাঁটিয়ে বলেন—মজাটা টের পাবে পরে। সাধনা-টাধনা তখন উড়ে যাবে দেখো তুমি—গুরুজনের কথা।

উড়ে যদি যায় যাবে। দুঃখ করব না; অভিযোগ করব না। মন্দকে ভাল ক'রে নেবার চেষ্টা করব। যদি না পারি, এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব অন্য কোথাও। কিন্তু মজাটা টের পেতে দাদার বেশি দিন দেরি হ'ল না। দু-চার দিন মাত্র।

কি রকম?

নিত্যপূজার আরতিতে প্রথম আপত্তি হ'ল। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ শুনলে নাকি তাদের গুণাহ্ হয়, নেমাজের বিঘ্ন ঘটে। কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় দেখা যায়, তুলসীগাছটা কে যেন উপড়ে রেখে গেছে রাতারাতি।

হায় হায়, কি সর্বনাশ! কে এমন করলে রে! ও নিবারণ, দেখ্ দেখ্। হা ভগবান্!

চীৎকারে নিবারণের ঘুম ভাঙিয়া যায়, দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া বারান্দার উপর হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে। তুলসীগাছটা কে যেন উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। পিসিমা তখন চীৎকার করিয়া চলিয়াছেন, তখনই বললাম, এসব অনাচার ঘরে ঢুকিয়ে কাজ নেই, তা তো শুনল না! এখন বাড়ি ঘর ছেড়ে চ'লে যাওয়া ছাড়া আর আমার কোন উপায় নেই। যাই চ'লে বৃন্দাবনের দিকে। নিবারণের দিকে তাকাইয়া বলেন, কি হ'ল? দেখলে তো? তখনই না বলেছিলাম। তুমি না এই গাছকে পূজো কর, জল ঢাল এঁর মাথায় তিরিশ দিন?—বলিতে বলিতে পিসীমা কাঁদিয়া ফেলেন।

দাদা প্রবোধ দিয়া বলেন, তুমি দুঃখ ক'রো না—তুমি থাম, আমি এর প্রতিবিধান করছি। জামা গায়ে দিয়া তিনি ভাদু শেখের বাড়ির দিকে ছোটেন। গ্রামের মুসলমানদের প্রধান ভাদু শেখ। তাহার নিকট গিয়া বলেন নিবারণ, ভাদু ভাই, আগে তো বলেছি এক আপত্তির কথা। এখন আবার তুলসীগাছটার এই দশা। পিসিমা কান্নাকাটি করছেন।

তা আমি কি করব, আমি কি আর এসব করতে বলেছি?—বিরক্তভাবে উত্তর দেয় শেখ সাহেব।

না না, তা কেন! বলছিলাম ওদের একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিন না। একটু যেন বাড়াবাড়ি করছে, তাই না?

ভাদু ভাই কি যেন ভাবিতে ভাবিতে দাড়িতে হাত বুলাইতে থাকেন। মাঝে মাঝে দাড়ি চাপিয়া ধরেন। তাঁহার মুখও কেন যেন ধীরে ধীরে কঠিন হইয়া উঠিতে থাকে। নিবারণের কথার কোন উত্তর দেন না তিনি।

কি ভাদু ভাই, সকলের সঙ্গে মিলে মিশে মানিয়ে নিয়ে চলাটাই ঠিক কি না বলুন?—দাদা আবার বলেন। ভাদু শেখ তবুও নিরুত্তর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিচলিতভাবে দাদা উঠিয়া পড়েন। ভারাক্রান্ত মন লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসেন সেদিন।

কিন্তু তবুও শচীন বলিতে থাকে, বুঝলেন দাদু, দাদাকে তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হতে দেখি নি কোনদিন। আশ্চর্য!

হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, অসম্ভব ধৈর্য তোমার দাদার। তারপর?

পরে একদিন সত্যি সত্যি বাড়ির ভিতর হাড়গোড় না কি সব পাওয়া যায়, শিয়াল-কুকুরে এনে ফেলেছিল বোধ হয়।

হরি হরি!—অবিনাশ বলিয়া উঠেন। বৃদ্ধ যেন এই সব কথা শুনিয়া মনের ভিতর ব্যথা অনুভব করেন। শচীন থামিয়া যায়।

কটা বাজে?—হাই তুলিয়া প্রশ্ন করেন অবিনাশ। ঘড়ি দেখিয়া শচীন উত্তর দেয়, বারোটা বাজতে তিন মিনিট বাকি এখনও।

তোমার খাওয়া হয়েছে?

না, এই যাব এখন। দিদিমার ভোগ রান্না বোধ হয় শেষ হয় নি এখনও। জানালার নিকট উঠিয়া গিয়া অন্দরমহলের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠে, না, এই হয়ে এল ব'লে। ওই তো ঠাকুরমশায় ভোগ দেবার জন্যে বিগ্রহ নিয়ে ভোগের ঘরে ঢুকছেন।

ও, তোমাকে এখানে খেতে বলেছে বুঝি ভাদুড়ীগিন্নী? এরই মধ্যে আলাপ জ'মে গেছে দেখছি! শচীন হাসিয়া বলে, না জমার কি

আছে বলুন, উনি তো আমাদের আসা অবধি প্রত্যেক দিন আমাদের বাসায় একবার ক'রে যান। পিসিমাও এখানে এসেছেন কতদিন।

মতির মা—বাড়ির পরিচারিকা, উপরে আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়ায়। প্রৌঢ়া হইলেও সঙ্কোচের দ্বিধা নাই যেন। মস্তবড় একটি ঘোমটা মাথার উপর টানিয়া দিয়া চাপা গলায় বলে, কর্তার মাথা ধুইয়ে দিতে হবে বাবু।

হ্যাঁ, এস।—বলিয়া শচীন আলনার উপর হইতে একখানি তোয়ালে তুলিয়া লয়।

দুইজনে মিলিয়া অবিনাশের মাথা ধোয়াইয়া দেয়। নীরদা দুধ লইয়া আসেন। অবিনাশ নীরদার মুখের দিকে তাকাইয়া একটু ইতস্তত করেন, প্রশ্ন করেন, ঠাকুরভোগ হয়েছে তো? ঠাকুরাণী বিরক্তভাবে উত্তর দেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে। ঠাকুরের ভোগ না হ'লে কি কখনও দুপুরে খেতে দিয়েছি, না, আপনিই খেয়েছেন? আমি যেন আর জানি না, আজ নতুন, না? জ্ঞানগম্যি নেই বুঝি? আই অ্যাম নো ফুল। কথাটা বলিয়া দিদিমা হাসিয়া ফেলেন। অবিনাশ আশ্বস্ত হন, একটু পাশ ফিরিয়া দুধের বাটিতে চুমুক দেন তিনি।

মতির মাকে উপরতলায় বসাইয়া শচীন খাইতে যায়। গঙ্গাধর ও শচীন পাশাপাশি খাইতে বসে। গলা খাঁকারি দিয়া গঙ্গাধর আরম্ভ করে, দেশের লোক এরই মধ্যে বলাবলি করছে—এতদিন পরে গ্রামে একজন লোক এল। আপনার দাদার কতই না সুখ্যাতি লোকের মুখে মুখে বেড়ে চলেছে! ঈষৎ হাসিয়া বলে, মাস্টার মশায়রা কিন্তু বলেন—ভদ্রলোকের মাথার একটু ছিট আছে। কথাটা বলিয়া গঙ্গাধর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে। শচীন হাসিতে গিয়া বিষম খায়।

দিদিমা রাগিয়া যান। বাপন, তোমার মাস্টারদের কথা আর ব'লো

না বাছা। তারা আবার এক-একজন মানুষ! হেডমাস্টারটা সন্দেহ-বাতিকে বউকে নিয়ে ঘর করে না। সেই যে নরেনবাবু না সুরেনবাবু—টেকো-মাথা—সে একদিন এমন ক'রে একটি ছেলেকে মেরেছিল, বললে বিশ্বাস করবে না ভাই।—চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া, হাতের আঙুলগুলি ফাঁক করিয়া দেখাইয়া দিদিমা বলেন, ছেলেটির পিঠে ইয়া বড় বড় কালো দাগ। আরে, এই যে চুনি ময়রার নাতি গো—ছেলেটি দুদিন জ্বরে প'ড়ে ছিল বেহুঁশ হয়ে। কি দোষ কে জানে! মাস্টার, না, পিশাচ—হ্যাঁ, গঙ্গাধর, তাই না? গঙ্গাধর মাথা নাড়িয়া বলে, চুনি বলেছিল কেস ক'রে মামলা হ'লে বুঝতে পেত মজাটা বিদ্যাদিগ্‌গজের দল।

আরও একটু ডাল-তরকারি দুইজনকে পরিবেশন করিয়া নীরদা জামবাটিটা ঘরের ভিতর রাখিয়া দই ও সন্দেশ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসেন। কাছে বসিয়া বলিতে থাকেন, এই যে কর্তার এমন একটা অসুখ, কই, কেউ তো এল না দেখতে এ পর্যন্ত? তাঁর দেওয়া সম্পত্তির আয়েই তো ইস্কুল চলছে, না কি বল? তোমার মাস্টাররা যেমন মানুষ—রাঁচি পাঠাতে হয় এক-একজনকে, তাদের আবার কথা! রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। বাবা, বাবা, ওদের কাছে ছেলে মানুষ হয় না, গাধা হয়।—দিদিমা মুখ বিকৃত করিয়া ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেন।

গঙ্গাধর দিদিমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, সেই যে বাঁড়ুজ্জের ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন, মনে নেই মা? নিবারণবাবু না থাকলে কি হ'ত বলুন তো? বামুন আসে না তো আসেই না। এদিকে সব ঠিকঠাক, বেলাও প্রায় নটা বাজে। শহর থেকে বামুন আসবে—দু-দুজন বামুন, এত বেলা পর্যন্ত তাদের টিকিটির দেখা পাওয়া যায় না। ভোর থেকে রান্না হবার কথা—দু শো লোক খাবে। কি উপায়? বাঁড়ুজ্জে ছুটলেন হেডমাস্টারের কাছে বোর্ডিঙের বামুনটাকে ব'লে ক'য়ে ধ'রে

আনতে। নেমন্তন্ন করলেন সবাইকে। নিবারণবাবু ব'সে ছিলেন, শুনেই বামুনকে নিয়ে ছুটে এলেন তিনি। আমিষ রাঁধল বামুন, নিরামিষ রাধলেন তিনি—আচার-ব্যবহারে কত না আন্তরিকতা আর উৎসাহ! পাটা খোঁড়া, তা নিয়েই কত না ছোটাছুটি—যেন নিজের বাড়ির কোন ব্যাপার হচ্ছে। বাঁড়ুজ্জেও কেলেঙ্কারির হাত থেকে বেঁচে গেলেন।

সুপারি লইয়া শচীন উপরতলায় উঠিয়া আসে, নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া দেখে, মতির মা পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। অবিনাশ তখন চোখ বুজিয়া শশধরের কথা ভাবিয়া চলিয়াছেন। তিনি কে শশধরের? পিতা কেবলমাত্র জন্মের কারণ। ওই সামান্য পরিচয় ব্যতীত শশধরের সহিত তাঁহার অপর কোন সম্পর্ক আছে কি? শশধর নিজের দাবীতে বাঁচিয়াছে—বাঁচিবার মত অবস্থা সে নিজেই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। শশধরের কুড়ি-বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহারা দুইজন একই গৃহে পরস্পরের সান্নিধ্যে বাস করিয়াছেন এইমাত্র। স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাই তাহার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কারণ। পৃথিবী হইতে সমস্ত কিছুই সে নিজেই আহরণ করিয়া নিজের প্রয়োজনে লাগাইয়াছে; কেহ তাহার হইয়া কোন কিছু করিয়া দেয় নাই। সাহায্য? সাহায্য তো প্রত্যেক শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ কিছু না কিছু পাইতেছে। তবে সকলেই সমানভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না কেন? সাহায্য বড় কথা নহে, বড় কথা প্রাণশক্তি। এই বাঁচিবার মূলে রহিয়াছে শাশ্বত প্রাণশক্তি, যাহা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেকেই অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ অধিকারী নহে—সমানভাবেও নহে। তিনি এবং শশধর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুইটি জীব—বিভিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারক। তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া শশধর জীবনের কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করিয়াছিল,

তিনি শশধরকে মানুষ করেন নাই। তবুও সাহচর্য হইতে এই যে মমত্ববোধ, ইহা তো মানুষেরই প্রাপ্য। মানুষই না এই মমতার জন্য যত কিছু ত্যাগ করিয়াছে! কেন শশধর সেদিন তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না? আর আজ এতদিন পরে সে কি আসিবে? না না, সে আসিবে না। স্নেহকাতর বৃদ্ধ শূন্য মনের ভিতর আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ান।

চোখের পলক লক্ষ্য করিয়া শচীন বুঝিতে পারে যে, বৃদ্ধ ঘুমান নাই। সে মতির মাকে বাহিরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করে। পাখা রাখিয়া সে বাহিরে যাইতেই অবিনাশ চোখ মেলিয়া তাকান।

শচীন বলে, মিক্‌শ্চারটা এবার খাইয়ে দিই দাদু। দিদিমা বললেন—ওতে নাকি ঘুমের ওষুধ আছে।

ঔষধ খাওয়াইবার পর শচীন ধীরে ধীরে বাতাস করিতে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই অবিনাশ ঘুমাইয়া পড়েন।

পাখা রাখিয়া শচীন জানলার কাছে আসিয়া বসে। রেল-লাইনের অপর পার্শ্বে সম্পদ-প্রাচুর্য লইয়া নূতন শহর গড়িয়া উঠিতেছে। এ দিকের এই সকল গ্রামের দুরবস্থা অবর্ণনীয়। ভগ্ন শ্রীহীন, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত।

বসন্তের সমাগমে কতকগুলি গাছ সতেজ ও সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ভিতর দুই-একটি মৃত তালগাছ শচীনের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ লাগে। সুন্দর রূপটি ধরা দিয়াও যেন ধরা দেয় না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তবে বিশেষ কোন নীতি প্রচার করা? সংশয় জাগে মনে।

বৃদ্ধ অবিনাশের দিকে শচীন তাকায় একবার। নিজের সুগঠিত পুষ্ট দেহটি লক্ষ্য করিয়া দেখে তারপর, তাহাতে যৌবন আসিয়াছে। বাস্তবিকই সময়ের নির্দেশ, সময় হইলে একটি বিশেষ ইচ্ছা, একটি বিশিষ্ট রূপ আপনা-আপনি প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করে। মাটি প্রতি মুহূর্তে

নিজের বুক হইতে লক্ষ কোটি রূপ দিয়া জীবনকে ছাড়িয়া দিতেছে, অসীম আনন্দের ভিতর কোন-না-কোন দেহকে অবলম্বন করিয়া জীবনের বিকাশ হইতেছে—ধারাবাহিকতায় পরিপূর্ণ স্বচ্ছ একটি জীবনস্রোত। তাহার ভিতর যে দেহ আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেই সেই মুহূর্তের জন্য উল্লেখযোগ্য বলিয়া, কাম্য বলিয়া মানুষ আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। অবস্থান ও আকৃতি দুই-ই ভুল করিয়া দেখিতেছে মানুষ। সীমার ভিতর আসিয়া সে প্রকাশ করে যে, সে আছে, নিজেকে সে ব্যক্ত করিতে চায়—সীমাকে নহে। মানুষ সীমাকে দেখে ভুল করিয়া, ভাবে, ইহা তাহার আকাঙ্ক্ষিত ধন।

হঠাৎ তাহার চো'খে পড়ে, জানলার নীচে দুইটি বুলবুল পাখি কামিনী-গাছের উপর বসিয়া পাকা পাকা লাল ফলগুলি খাইতেছে। পাখিকে পাইয়া গাছটির পাতায় পাতায় অপূর্ব শিহরণ জাগিয়াছে, ডালগুলি দুলিতেছে। মাঝে মাঝে শিস দিতেছে পাখি দুইটি।

নিবারণের নিকট হইতে টাকা লইয়া পচু বাড়ি ফিরিল। ডাক্তার-বাবু বরফ কিনিতে বলিয়াছেন। লক্ষ্মীর শিয়রে বসিয়া পচুর স্ত্রী বাতাস করিতেছিল। সে কাছে গিয়া টাকা দেখাইয়া বলিল, দেখ নি, মাস্টারের দয়া। আমাকে ডেকে, নিজে যেচে বরফ কিনতে দিলেন। হ্যাঁ রে, জ্বর একটু কমেছে না? সন্তর্পণে মেয়ের গায়ে হাত দিয়া বলে, হুঁ, কমেছে তো, অনেক কমেছে, না রে? মানদা কথার কোন উত্তর দেয় না, তাহার চুলের গোড়া তখনও ব্যথায় ঝনঝন করিতেছিল।

ঘোমটা তুলিয়া ধরে পচু। মানদা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। তাহা হইলে মেয়ের জ্বরটা কমিয়াছে, ভাতে কোন কুফল কিংবা বাড়াবাড়ি হয় নাই। সে শান্তি পায় যেন।

নে, ওঠ্। বরফ-টরফ আর দরকার হবে না বোধ হয়। এইবার

জ্বর ছেড়ে যাবে। ও ঘুমোচ্ছে। ওঠ্, খেতে দে আমাকে, বড্ড খিদে পেয়েছে আমার।

ঘোমটা ছোট হয়। পচুর সহিত মানদা সেদিন ভাত না খাইয়া পারে না, পচু ছাড়ে নাই।

ভাত খাইয়া পচু মহা উৎসাহের সহিত বাঁশ ছিলিতে আরম্ভ করে। মনে মনে ঠিক করে, অনেকগুলি ঝুড়ি ও চাটাই সে তৈয়ারি করিবে আজ। লক্ষ্মীর জন্য ডাক্তারের খরচ আর ওষুধের দাম, জমিদারের খাজনা, মানদার জন্য লালপাড় শাড়ি একখানা, আর যদি টাকা বাঁচে মেয়েটার জন্য একটি জামা—উহার জামা অনেক দিন হইল ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

নীরদা ঠাকুরাণীর সহিত পিসিমা উপরতলায় যান; দরজার আড়াল হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখেন, অবিনাশ অঘোরে ঘুমাইতেছেন, কিন্তু মুখে যেন একটা বিষাদের ভাব মিশিয়া আছে।

শচীন দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া জানলার ধারে বসিয়া ছিল। সে দেখিতেছিল একটা বুলবুল অপরটির কাছে গিয়া মাঝে মাঝে বলিতেছে—কি যেন বলিতেছে পাখিটি। বোধ হয় একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না অথবা ভয় পায়, পাছে অন্য কোথায়ও চলিয়া যায়। ঝাউগাছের অবিশ্রান্ত হু-হু শব্দের সহিত তাহারও একটি দীর্ঘনিশ্বাস অকারণেই যেন বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়।

পিসিমা ও নীরদা শচীনের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া যান।

ঢং করিয়া শব্দ হয় ঘড়িতে। দেড়টা বাজে। শচীন চেয়ারে আসিয়া বসে, দাদার ফিরিবার সময় হইয়া আসিল।

অবিনাশের ঘুম যখন ভাঙে, তখন প্রায় দুইটা বাজে। জাগিয়াই ঘড়ির দিকে তাকান অবিনাশ, অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছেন তিনি। শচীন

তাড়াতাড়ি জল দিয়া মুখ চোখ মুছাইয়া দিয়া ঔষধের সাদা একটা বড়ি খাইতে দেয়।

ফলের রস খাইবার সময় হইল। গঙ্গাধরবাবু ফল কিনিতে বাজারে গিয়াছেন কি না কে জানে, ভাবে শচীন।

এমন সময় বউদিকে সঙ্গে করিয়া দিদিমা আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়ান। বউদির কোলে খুকু, তিনি ঘরের ভিতর ঢুকিতে যেন ইতস্তত করেন। দিদিমা বলেন, না না, লজ্জার কি আছে গৌরী! ও শচীন। আমাদের নিবারণ মাস্টারের ছোট ভাই শচীন। অবিনাশের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, উৎফুল্ল ভাবে বউদিকে ডাকেন, এস, দিদি এস। হাত বাড়াইয়া দেন বৃদ্ধ। গৌরী খুকুকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া খাটের এক প্রান্তে বৃদ্ধের কাছে আসিয়া বসেন।

কেমন আছেন এখন? বেশ ভাল বোধ করছেন তো? কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে গভীর মমতার সহিত গৌরী জিজ্ঞাসা করেন, যন্ত্রণাটা ক'মে গেছে তো?

হ্যাঁ, কমেছে। বেশ ভাল আছি দিদি—এখন বেশ ভাল আছি। বৃদ্ধ পরম তৃপ্তির সহিত গৌরীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। সে দৃষ্টিতে নির্ভরতা প্রকাশ পায় যেন। গৌরী সঙ্কুচিত হইয়া মুখ নীচু করেন, পাতলা চুলগুলির ভিতর দিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে থাকেন, শোনা অবধি কি চিন্তাটাই না হচ্ছিল! হাতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো আর ফুরসুৎ নেই। এখন নিশ্চিন্ত হলাম।

বৃদ্ধ পাশ ফিরিয়া গৌরীর কোলের উপর একখানি হাত মেলিয়া দেন। মতির মা দিদিমার জন্য পাশের কামরা হইতে একখানি বেতের চেয়ার আনিয়া দেন। দিদিমা বসেন।

ডাক্তার কোথায়? কি করছে এখন?—অবিনাশ প্রশ্ন করেন।

এইমাত্র মেয়েদের ওয়ার্ডে গেলেন। কি নাকি একটা জটিল ধরনের রোগী এসেছে!

শচীন ইহার পূর্বে গৌরীকে কখনও দেখে নাই। সে এতক্ষণে বুঝিতে পারে, গৌরী হাসপাতালের ডাক্তার শরৎ হালদার মহাশয়ের স্ত্রী।

ডাক্তারবাবু কখন আসবেন? এখানে আসবার কথা কিছু বলেছেন?—শচীন একটু সঙ্কোচের সহিত গৌরীকে প্রশ্ন করে। উদ্দেশ্য আলাপ পরিচয় করা।

বউদি শচীনের মুখের দিকে তাকান। শচীনের যেন মনে হয় এমন সুন্দর ও সরল মুখ সে জীবনে দেখে নাই। সে মুগ্ধ হইয়া যায়। গৌরীও শচীনের সেই দৃষ্টির সম্মুখে একটু বিব্রত বোধ না করিয়া পারেন না। দ্বিধা কাটাইয়া উঠিতে সামান্য একটু দেরি হয় যদিও, উত্তরটা কিন্তু সহজভাবেই দেন তিনি—চারটে নাগাদ আসবেন বোধ হয়। আমরা তো তাঁর সঙ্গেই এখান থেকে ফিরে যাব কথা আছে। মুখ নীচু করিয়া বউদি বৃদ্ধের আঙুলগুলিতে ধীরে ধীরে চাপ দিতে থাকেন।

আচ্ছা বউদি!—বলিয়াই শচীন হাসিয়া ফেলে। বউদি বলিয়া ডাকিতে কেন যেন বড় ভাল লাগে শচীনের। অনেক দিনের সাধ, তাহার যদি এমন একটি বউদি থাকিত! গৌরীও হাসিয়া ফেলেন। হাসিলে তাঁহাকে আরও সুন্দর দেখায়।

আচ্ছা বউদি, হাসপাতালে কতগুলি বেড?

সবশুদ্ধ পঁচিশ। মেল ওয়ার্ডে পনের আর ফিমেল ওয়ার্ডে দশ। ওঁর দানেই তো হাসপাতাল।—বৃদ্ধকে দেখাইয়া দেন গৌরী।

না না, আমার দানে কোথায়? তুমি যে আমাকে একেবারে দানবীর মহাপুরুষ বানিয়ে ছাড়লে হে! সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠেন।—আমি শুধু হাসপাতালের জায়গাটা দিয়েছি আর খরচখরচা চালাবার জন্যে সামান্য কিছু সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের নামে লিখে দিয়েছি। বাকি আর

যা সব সরকার থেকে ক'রে দিয়েছে। তা না হ'লে কি সম্ভব হ'ত ভাই, এমন সুন্দর হাসপাতাল! আমার দিদিকে হয়তো পেতাম না কোনদিন। এখানে আসা অবধি মাঝে মাঝেই দু-এক ঘণ্টা ক'রে—কেমন তাই না দিদি? হাসিয়া গৌরীর মুখের দিকে তাকান বৃদ্ধ। বউদি মাথা নাড়েন।

বউদির সহিত শচীনের আলাপ জমিয়া উঠে। একই জেলাতে বউদির পিত্রালয় এবং শচীন ও নিবারণের পৈতৃক বাসগ্রাম। নীরদা চেয়ারে বসিয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে থাকেন। রাণু তাহার বড় ভাই-বোনের সহিত জানলার ধারে গিয়া দাঁড়ায়। সকলে মিলিয়া বাহিরের জিনিসগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখে আর হাসে। রাণু মাঝে মাঝে ফিরিয়া ফিরিয়া দেওয়ালে সংলগ্ন সেতারটির দিকে তাকায়। জিনিসটার প্রতি তাহার কৌতূহলের সীমা নাই। কাহারও সহিত চোখাচোখি হইলে হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া জানলার দিকে সরিয়া যায় আর লজ্জা পাইয়া হাত দিয়া মুখ ঢাকে।

বউদি বলেন, বড়দা এখনও বাড়িতে আছেন, একাই আছেন। আর সবাই অনেক দিন হ'ল চ'লে এসেছে। ছোড়দা আছেন জলপাইগুড়িতে। বউদিরা ছেলেপিলে নিয়ে সেখানেই থাকেন। তবে বড়দা সেদিন লিখেছেন, মন নাকি তাঁর সত্যি সত্যি উঠেছে এবার। বিষয়-সম্পত্তির কি যে অবস্থা হবে কে জানে!

উত্তরে শচীন বলে, দাদাও কি আসতেন নাকি? ইনিও সহজে আসেন নি বউদি। বলতেন, ম'রেও যদি যাই তবুও পূর্বপুরুষের এই ভিটে ছেড়ে যাব না কিছুতেই। কিন্তু ছাড়তে তো হ'ল।

বউদি আগ্রহের সহিত বলেন, কি রকম! কি রকম!

যে সব ঘটনা ঘটতে লাগল পর পর, তারপরও কি আর—? বলছি শুনুন।

বাবু, বাবু!—ঘরের পিছন থেকে ডাকে মনিরুদ্দিন। গলার শব্দটা যেন চাপা চাপা। বই পড়ছিলাম তখনও আমি। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। রাত প্রায় বারোটা বাজে, দাদা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কে? কে ডাকে? আমার যেন কেমন ভয় করতে লাগল।

আমি, আমি মনির। কে, ছোটবাবু? ভয় নেই, আমি মনির। জানলাটা একটু খুলুন না ছোটবাবু।

মনির ভাই? এত রাত্রিতে?—বিস্ময়ে প্রশ্ন করি আমি।

আস্তে ছোটবাবু, আস্তে কথা বলুন। তা না হ'লে সব টের পেয়ে যাবে ব্যাটারা, কাজকম্ম সব নষ্ট হয়ে যাবে।

আমি জানলাটা খুলে দিই। মনিরুদ্দির জানলার কাছে দাঁড়ায়।

বড়দা কোথায়?

ওই তো ঘুমচ্ছেন। ডাকব?

হ্যাঁ, ডাকুন। দাদা উঠলেন। বললেন—কি মনির ভাই, কি খবর? এত রাত্রিতে? মনিরের চোখে মুখে আসন্ন বিপদের ছায়া। চাপা গলায় বললে, দাদা, সর্বনাশ হয়ে যাবে আর একটু দেরি করলে। ওই যে সেই ছোকরাটি বাইরে থেকে এসেছে কয়েক মাস হ'ল—গঞ্জের দিকে পান-বিড়ির দোকান করেছে বকুলগাছটার নীচে—মনে পড়ছে, সারাদিন কি সব উর্দু গান গায়, ওরা নাকি ঠিক করেছে আজ রাতে মধু পালের মেয়ে—সেই যে সোহাগী, সেই সোহাগীকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে সাদী করবে! মধু পালও আজ বাড়ি নেই। মাতব্বর ভাদু শেখেরও নাকি মত পেয়ে গেছে সে।

কাছাকাছি কোথায় যেন কড়কড় শব্দে একটা বাজ পড়ে। আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি; বিশ্বাস করতে পারি না, এও কি সম্ভব? আমার পায়ের নীচ থেকে মাটি যেন স'রে যেতে থাকে।

দাদার মূর্তি তখন ভয়ঙ্কর, দাদাকে যেন চেনা যায় না। বউদি, নিবারণদার সেই মূর্তি আমি জীবনে ভুলতে পারব না। দাদার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে যেন, স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। শুধু বাঘের মত চোখ দুটি জলজ্বল করতে লাগল। চিন্তা ক'রে কি যেন ঠিক ক'রে নিলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, আচ্ছা, দেখা যাক। দেখলাম নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে একটু চেপে ধরেছেন দাদা।

বউদির চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিদিমাও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া শচীন থামিয়া যায়।

ও কি, থামলেন কেন?—বউদি চোখ মুছিতে মুছিতে বলেন, বলুন, না না, ব'লে যান আপনি তারপর কি হ'ল?

শচীন বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া পুনরায় বলিতে থাকে, আমার দিকে তাকিয়ে দাদা বললেন—টাকা। আমি বিছানার নীচ থেকে কতকগুলি নোট দাদার হাতে দিলাম; মনে হয় টাকা-গুলো পর্যাপ্তই ছিল। অকেজো পা নিয়ে এক লাফে জামা ও টর্চটা হাতে তুলে নিলেন। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—পিসিমাকে ব'লো না এ সব কথা। আর দেখ, সংবাদ না পেলে ব্যস্ত হবে না তোমরা। সাবধানে থাকবে। জানলাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন একবার—মনির ভাই, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তো? একা কি পারব?

মনিরুদ্দিন উত্তর দেয়—হ্যাঁ বড়দা, জান্ কবুল, কোন ভয় নেই; আমি আছি।

অবিনাশ মাথায় বাতাস করিতে ইঙ্গিত করেন। বউদি পাখাখানি হাতে তুলিয়া বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়া বলেন, তারপর? তারপর?

দরজা খুলে সন্তর্পণে বের হয়ে অন্ধকারে মিশে যান। কোথায় যাবেন

কি করবেন, কিছু জানবার সময় ছিল না তখন। শুয়ে পড়ি আমি, কিন্তু ঘুমুতে পারি না কিছুতেই।

সেই রাত্রিতে কালীগঞ্জের ঘাট থেকে একটা নৌকো চুরি যায়। নৌকোতে যাত্রী ছিল দুজন মাত্র—সোহাগী আর তার বড় ভাই ভুবন। নৌকো চালিয়েছিল মনির ভাই ও দাদা। কলকাতার ট্রেনে তাদের তুলে দিয়ে তার পরদিন বিকেলে তাঁরা ভিন্ন রাস্তায় বাড়ি ফিরে আসেন। এই তো সেদিন কলকাতায় দাদার সেই বন্ধুর বাসায় থেকে বেশ ভাল একজন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে সোহাগীর। কি অদৃষ্ট দেখুন দিকি বউদি! শচীন বউদির মুখের দিকে তাকাইয়া উত্তরের অপেক্ষা করে।

নীরদা ও গৌরী একসঙ্গে বলিয়া উঠেন, তারপর? তারপর কি হ'ল? তাঁহারা যেন এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া এই চমকপ্রদ কাহিনীটি শুনিতেছিলেন।

শিকার হাতছাড়া হয়ে গেলে সাপ বাঘ যেমন করে, একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল ছেলেটা। মনিরের স্ত্রীর কাছ থেকেই কথাটা নাকি রাষ্ট্র হয়ে যায়। দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ গেল গোপনে—দাদা সরকার-দ্রোহী হলেন, সুতরাং স্থান হ'ল তাঁর হাজতে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও দাদার বিরুদ্ধে মামলাটা দাঁড় করাতে পারল না ওরা, ছেড়ে দিলে দু মাস পরে। ভোগান্তি ছিল কপালে।

কথাটা শেষ হইতে না হইতে নিবারণ ঘরের ভিতর প্রবেশ করে; সঙ্গে গঙ্গাধর ফল হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। শচীন সোৎসাহে বলিয়া উঠে, এই যে, এই আমাদের জেলমুক্ত সেই দাদা।

বউদি মাথার ঘোমটাটা একটু বড় করিয়া টানিয়া দেন। নিবারণকে লক্ষ্য করিয়া শচীন বলে, দাদা, ও দাদা, হাজত থেকে ফিরে এসে পিসিমাকে কি সব বলছিলে বল না একবার, দিদিমা বউদি শুনতে চাইছেন। বল না, তোমার কথা তোমার মুখেই মানায় ভাল।

নিবারণ যেন লজ্জা পায়, হাসিয়া বলে, ও, সেই সব কথা হচ্ছে বুঝি! তোমার আর কি, গল্প পেলে কি আর রক্ষা আছে!

বল না!—শচীন জেদ ধরে।

এমন আর কি বলেছিলাম! আমার তো কিছু মনে পড়ে না। নিবারণ পুনরায় হাসিয়া ফেলে। ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় সে।

না, মনে নেই, মনে নেই আবার! ফিরে এসে বল নি এ কথা—পিসিমা, আমার মনের জোর তো এখনও এত বেশি হয় নি যে, আমি এই সব অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করি? শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছি, শক্তিকে পাবার জন্যে আমার সাধনাও চলেছে। মনের ওপর সে বিশ্বাস তো আমার এখনও হয় নি পিসিমা। তাই ভয় হয়, পাছে আমি সমতা হারিয়ে ফেলে একটা কিছু ক'রে বসি। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি—মনটা আমার যদি নষ্ট হয়ে যায়, দুষ্ট হয়ে বিষাক্ত হয়ে ওঠে তখন কি উপায় হবে? অনেকটা কাপুরুষের মতই আমাদের চলে যেতে হ'ল এবার। চল পিসিমা, চল এবার।

মাথা নত করিয়া সকলেই শুনিতে থাকে কে যেন ফিসফিস করিয়া সবাইকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলে—চল, চল। বোধ হয় আর দেরি করা ঠিক হবে না। জীবনের কত শত স্মৃতিতে ভরা বড় আদরের এই ভিটা মাটি ছেড়ে চল যাই—অন্য কোথাও ঘর বাঁধতে হবে আবার, বিশ্বাস ক'রে নূতন ভাবে সংসার পাততে হবে। ভাবছ ব'সে ওইখানে তোমার দাদু খেত বসত শুত, না? কত সুখের স্মৃতি! ভাব ব'সে, আমরা চলি। যে জায়গাটা তোমার ছিল, গর্ব ক'রে বলতে—এটা আমার জমি, সে জমি যে পরের হয়ে গেছে তা জান না? অবাক হয়ে বলছ তুমি, জান না! জেনে আর লাভ কি আছে বল, এবার চল। যে মাটি থেকে তুমি উঠেছ, উঠেছে তোমার সঙ্গী-সাথীরা, সে মাটিকে এবার ভুলতে চেষ্টা কর। ভুলতে হবে তোমাকে।...তবুও ভাবছ কালীগঞ্জের পাশ

দিয়ে করতোয়া নদী তরতর ক'রে ছুটে চলেছে—কি ভীষণ স্রোত তার, কত দিনের পরিচয় তার সঙ্গে, সে কি মনে রাখবে না? এই যে আজ তারই বুকে পাল তুলে দিয়ে নিরুদ্দেশে যাবার মত যাত্রা করছ—প্রতি জনকেই তো সে চেনে, সে কি ভুলে যাবে? তার মনে ব্যথা লাগবে না এতটুকু?

ওই যে গ্রামের শেষ সীমানায় অতি বৃদ্ধ তেঁতুলগাছটি তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে কত না ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেছে, দু-দুবার ভেঙেও পড়েছে তবুও মরতে পারে নি—প্রহরীর মত কত যুগ ধ'রে না দাঁড়িয়ে আছে, সেও কি ভুলে যাবে? না না, সে ভুলতে পারবে না, সে মনে রাখবে নিশ্চয়। সে যে দেখেছে সব। তার ছায়াতেই আজ সকলে এসে জড়ো হয়েছে—যাত্রা তো শুরু হ'ল এখান থেকেই। মনে মনে সে হয়তো বা কেঁদেছে।

শ্মশান। যে শ্মশানের পাশ দিয়ে দাদার বাবা বিধুশেখর চক্রবর্তী মশায় প্রতি ছুটিতে রতনপুর থেকে দাদাকে নিয়ে ফেরবার সময় থেমে যেতেন, থেমে গিয়ে বলতেন—প্রণাম কর, প্রণাম কর বাবা। নিজে হাত জোড় ক'রে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে বলতেন—অতি পবিত্র স্থান এ, এখানে তোমার মা, ঠাকুমা, ঠাকুরদাদা ঘুমিয়ে আছেন। প্রণাম কর।

ওই তো ওইখানে সিদ্ধেশ্বরীতলা—বটগাছের নীচে। আশেপাশের গ্রামগুলিতে প্রতি আষাঢ়ে পূজোর ধুম পড়ে যেত। কয়েক বছর আগেও মায়ের সামনে দুটো-একটা মোষ বলি হ'ত। বলি দেখতে বড় ভয় করত দাদার, কাছে থাকতে পারতেন না তিনি। 'আসি' ব'লে পালিয়ে যেতেন, আর ফিরতেন না। অতবড় মাঠটা জুড়ে মেলা বসত—কত না দোকানপাট, গানবাজনা, আহ্লাদপ্রমোদ! হ্যাঁ, অনেক দিনের কথা সে। সেবার সেই মেলার পরে দু-একখানি দোকান নাকি থেকে

যায় পাকাপাকিভাবে। তার পর থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে গঞ্জটি। আর তবেই তো আজ এত বড় কালিগঞ্জের বাজার।

মধু পালের টিনের ঘরটা বিক্রি হয়ে গেছে, টিন খুলে নিচ্ছে ওই। ওই টিনের ঘর তোলবার সময় মধুর মা হেসে বলেছিল—আমার মধুর একটা কিছু হ'ল এতদিনে। হায় রে মধু!

গঞ্জের সারি সারি টিনের ঘর, হয়তো তাদের কেউ কেউ থাকবে, হয়তো বা কেউ থাকবে না। কিছুদিন পরে গঞ্জের রূপটাই হয়তো বদলে যাবে। কিন্তু ওরা কি এদের চিনতে পারবে না, আবার যদি কোনদিন ফিরে আসে এরা? যারা আজ চ'লে যাচ্ছে, চোখের জল ফেলতেও যাদের সাহস নেই, তাদের ওরা ভুলে যাবে? না না, ভুলে যাবে না ওরা। ভুলতে কি পারে কখনও—এতদিনের পরিচয় যে!

গভীর রাতে মা-পিসিমার পাশে শুয়ে কি কেউ শুনবে না মংলা কামারের হাতুড়ির শব্দ—ঠং ঠং ঠং। হাটের কাজ ক'রে চলেছে মংলা, কাস্তে কোদাল আরও কত কি! না না, সে শব্দ তো আর হবে না। ওই যে, ওই তো মংলাও চলেছে দলের সঙ্গে ঝোলা কাঁধে। তার ঘরের পেছনে ডোবার ধারে গাছের ওপরকার সেই মহাজন পাখিটা প্রহরে প্রহরে ডেকে চলবে, আজও যেমন ডাকে। যারা চ'লে যাচ্ছে তারা আর কোনদিনই শুনবে না সে ডাক। কি ক'রে শুনবে বল, তারা যে চ'লে যাচ্ছে আজ!

ওই তো গোপীযন্ত্র হাতে কৃষ্ণদাস বাবাজীও চলেছে ওই দলে, ভাবে ভরা সুন্দর হাসি হাসি মুখখানি। তার ভোরবেলার সেই 'ভবে কি আছে সম্বল' গানটা বাউলের সুরে কি মিষ্টিই না লাগত! 'সম্বল' পুরোটা শোনা যেত না, শুধু 'সম্ব—' ব'লে টেনে নিত বাবাজী। রেশটা যেন আকাশে বাতাসে আজও মিশে আছে।

চর—মস্তবড় বালির চর। দাদা [illegible] পড়তেন বালির ওপর। চোত-

বোশেখ মাসে ধু-ধু করত বালি। আট-ন বছর বয়স, প্রায় সম্পূর্ণ দিগম্বর তবু। বিধুশেখর চক্রবর্তী পড়াশোনার জন্য তাড়া দিতেন না, মা-মরা ছেলে। বালি দিয়ে গলা অবধি ঢেকে ব'সে থাকতেন দাদা—ব্যোম-ভোলা সেজে।

আকাশ জুড়ে মেঘ আসত। কাল-বৈশাখীর মেঘ, ঘন কালো মেঘ। নদীর ওপরেই দাদার বাড়ি। ঝড় উঠে আসত দেখতে দেখতে। মাঝে মাঝে ঝিকিমিকি বিদ্যুতের আলোর খেলা। তা দেখতে দাদার বড় ভাল লাগত বোধ হয়। দাদা, ওই যে গোলাপ-যুঁয়ের বাগানের সামনে টিনের ঘর, তারই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন আর হাসতেন। তন্ময় হয়ে মাঝে মাঝে কি যেন ভাবতেন! গর্জন হ'লে চমক ভাঙত, তাড়াতাড়ি কানে আঙুল দিতেন দাদা। বৃষ্টি হ'ত। তার একটু পরেই সব পরিষ্কার—আকাশে চাঁদ উঠত। দূরের ওই স্বচ্ছ করতোয়ার জলে পূর্ণিমার চাঁদের আলো নেচে নেচে উঠত, কখনও বা হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ত। পরদিন নদীর বুকে দুর্যোগের চিহ্নমাত্র থাকত না, সূর্য উঠত বাঁকের ওই পাশ থেকে। গোলাপের বনে দাঁড়িয়ে তা দেখতে দাদার বড় ভাল লাগত। মস্তবড় থালার মত সূর্য।

কে থাকবে? থাকবে শুধু ভোলা কুকুর, দাদার বহুদিনের সঙ্গী ভোলা—বৃদ্ধ ভোলা। ভোলা, তুমি থাক, কেমন! তোমাকে নিতে পারলাম না সে জন্য অকৃতজ্ঞ মনে ক'রো না যেন। তুমি থাক বন্ধু আমার, কাউকে এ বাড়িতে ঢুকতে দিও না তুমি, দিও না ভোলা—এ বাড়ি যে আমার!

পিসিমা, দাদা, আমি ঠাকুরঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। চারিদিকে কেমন যেন একটা নিঝুম নিস্তব্ধ ভাব। সকলের চোখ দিয়েই টসটস ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে মাটির ওপর। মাটি! তোমার দানের কথা, ঋণের কথা ভুলতে হবে এবার। দু ফোঁটা চোখের জল দিয়ে গেলাম

শুধু, মনে রেখো, ভুলো না যেন। জানি, আর সকলেও যদি ভুলে যায়, তুমি ভুলতে পারবে না কিছুতেই।

চল, চল। নিঃস্ব নিপীড়িত নরনারীর দল—শিশু বালক যুবা বৃদ্ধ—সকলেই পথ চলতে থাকে নীরবে নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এ ওকে চুপে চুপে ডেকে ডেকে বলে—চল চল, আর কেন? ভীত ত্রস্ত ক্লান্ত মুখে অজানা পথের দিকে এগিয়ে চলে তারা।

ভয় কি ছোঁয়াচে? ভয় বোধ করি ছোঁয়াচে, না? ভয় শুধু ভয় দেখিয়েই ভয় দেখায়। তবে কি ভয়েই? কিসের ভয়ে পালাচ্ছে এরা? প্রাণের ভয়? না না, প্রাণের ভয় তো নয়। তবে কিসের ভয়? অনাদরের ভয়। অসম্মান, অপমানের ভয়। নতুবা যার মনে আজও মৃত্যুর জন্য কোন ভয় নেই, সকলের আত্মীয় যে, সে কেন যায়? তাকেই বা কেন যেতে হয়, যে কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিল দিনটা, খেল না কিছুই—খেতে পারে নি সে। কেন? কেন খায় নি, জানেন?

কেন খাবি না তুই?—জিজ্ঞাসা করেন পিসিমা, কেন, কি হয়েছে তোর?

কি ক'রে খাব বলুন তো পিসিমা। খেতে তো ইচ্ছা হয় না আমার। এত দুঃখ এত কষ্টের মাঝখানে আমার খাওয়া কি শোভা পায়? ছেড়ে দেব ব্যবসা আমি কাল থেকেই।

এই রে, মাথায় আবার ভূত চেপেছে দেখ্। সে আবার কি? দুঃখ কষ্ট মানুষের কর্মফল, সকলেই জানে। তাতে ব্যথা যদি পাস, মানুষের কষ্ট দূর করবার চেষ্টা কর্ যতটুকু পারিস। সেজন্যে না খেয়ে লাভ কি? কেন খাবি না? আশ্চর্য হইয়া পিসিমা বলেন, এমন কি হ'ল বল্?

তাঁতিপাড়ায় গিয়েছিলাম কাপড়ের খোঁজে, সুতোর দাদন দেওয়া কাপড়ের তাগাদায়। একটা প'ড়ো ঘরের পাশ দিয়ে ফিরছিলাম। হ্যাঁ,

প'ড়ো ঘরই তো বটে, নিশ্চয়ই প'ড়ো ঘর, ওই তো চালে খড় নেই। না না, ওর ভিতর মানুষ থাকতে পারে না। কিন্তু কে যেন কাশে খুক খুক ক'রে। ঘরটাতে ঢুকে পড়ি আমি—স্যাঁৎসেতে অন্ধকার ঘর। বাইরে থেকে ঢুকলে হঠাৎ কিছু চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। ঝাপসা ভাবটা কাটলে দেখি, মানুষ একজন, পিসিমা, আমাদের মতই একজন মানুষ। হাত-মাকুতে গামছা বুনে চলেছে, একটু কুঁজো হয়ে গেছে যেন সে। বয়সটা বোঝা যায় না, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে বোধ হয়, কিন্তু কবে যে তার শৈশব কৈশোর যৌবন এসে চ'লে গেছে টেরও পায় নি বুঝি। তাঁত বুনছিল সে, আর মাঝে মাঝে কাশছিল। বাইরের এই বিরাট পৃথিবীর সেও তো একজন, কিন্তু কোন খবর রাখবার সময়ই বোধ হয় তার জীবনে হয়ে ওঠে নি।

সেদিন সে ঘরে এসে এ কথা পিসিমাকে বলে আর কাঁদে, সে কেন চ'লে এল তার ঘর বাড়ী আর এই সব আত্মীয়দের ছেড়ে? কে বলবে, বউদি, কে বলবে, বলুন তো?

তারপর যাত্রার হয় শেষ।

চাপা—চাপা প'ড়ে গেছে; চাপা প'ড়ে গেছে কে?—চীৎকার ওঠে জনতার ভিতর থেকে। সর, সর, আহা, চাপা প'ড়ে গেল রে! আমার কি সর্বনাশ হ'ল রে, বাছা আমার কোথায় গেল রে!—কোন মায়ের আর্তনাদ নিশ্চয়। দাদা ঠিক থাকতে পারেন না। ভীড় ঠেলে জল নিয়ে ছুটে যান দাদা। তখন সব শেষ, সব শেষ হয়ে গেছে তখন।

দিদিমা ও বউদি নীরবে অশ্রুমোচন করিতে থাকেন। রাণু আসিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে, না, সব শেষ না। মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে সে।

সব শেষ না?—বলিয়া বউদি রাণুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুমু খান। রাণু খিলখিল করিয়া হাসিতে থাকে। ঘরের আবহাওয়া

পুনরায় লঘু হইয়া উঠে। সে হাসিতে ব্যথা বেদনা সব যেন তাঁহারা ভুলিয়া যান। কে যেন ডাকিয়া কানে কানে আশ্বাস দিয়া বলে, তোমাদের সব শেষ হয় নাই। তোমাদের আশা আছে। বউদির আর দুইটি ছেলে মেয়ে তখন জানালায় দাঁড়াইয়া খেলার ছলে কত কি বলিতেছিল! ছেলেটি তাহার ছোট বোনটিকে বলে, আমি যা দেখি তুই তা দেখিস? অপরজন বলে, হাঁ্যা।

আমি দেখি একটা স্টীম রোলার। ওই তো।—বলিয়া দেখায় অপরজন। দুইজনেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠে।

আমি যা দেখি তুই তা দেখিস?

হাঁ্যা, তা দেখি।

আমি দেখি একটা শকুন। ওই তো।—বলিয়া অপরজন আকাশের দিকে দেখায়। আকাশে কতকগুলি চিল উড়িতেছিল তখন।

ধ্যাৎ, ওগুলো বুঝি শকুন? ওগুলো তো চিল।

না, ওগুলো শকুন।

যাঃ, গাধা কোথাকার।—মাতব্বরের ভঙ্গিতে বলে খোকা।

তবে কোথায়, বল?

আগে বল্ পারলি না, তারপর দেখাব।

পারলাম না দাদা।

ওই দেখ্, ওই যে, ওই ভাঙা বাড়িটার পাশে, ডোবাটার ধারে। ঘাসের ভেতর কি একটা মরা জিনিস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কি, দেখতে পেয়েছিস?

খুকু না দেখিয়াও বলে, ও।

ফলের রস লইয়া নিবারণ ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। শচীন দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলে, এবারে একটা হাসির কথা বলি, শুনুন দিদিমা।

বলি, ও—ও মশাই, শুনছেন? এদিকে আসুন তো।

দাদা এক আন্সার-পুঙ্গবের পাল্লায় প'ড়ে যান। মনে হয় বড় একজন অফিসার। কাছে গিয়ে হুকুম তামিল করেন। আমিও দাদার সঙ্গে যাই, কি জানি কি, বলা যায় না তো।

সাহেব হাঁকেন—জামার নীচে উঁচু উঁচু ঠেকছে, কি আছে ওতে, বের করুন তো। দাদা প্রথমে একটু যেন ঘাবড়ে যান। আমি বলি—মশায়, দামী জিনিস, চলুন না, ও-পাশটাতে দেখাব। কিন্তু দেখবার পরে গাল-মন্দ করবেন না তো! কথাটা ব'লে আমি হেসে ফেলি। সাহেব বুঝে ফেলেন, জিনিসটা বিশেষ কোন দামী জিনিস নয়। কি আছে মশায়, কি জিনিস?—হাসতে হাসতে তিনি নরমভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

দাদা উত্তর দেন গম্ভীর হয়ে—পোর্টেবল ভগবান।

সাহেব অবাক হয়ে বলেন—সে কি?

আমি বলি, বুঝলেন না?

দুই চোখ বড় বড় ক'রে বলেন—না তো। পোর্টেবল গ্রামোফোন রেডিও বুঝি, কিন্তু—। সাহেব ভাল ইংরাজী জানেন দেখা যায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পোর্টেবল ভগবান, দেখবেন আসুন, কিন্তু ঠাট্টা করবেন না যেন। দাদাকে নিয়ে এগিয়ে যাই। আড়ালে গিয়ে খুলে দেখাই শালগ্রাম-শিলাগুলি। হেসে বলি, দেখেছেন মশায়, আগেকার দিনের বামুনদের বুদ্ধি! সাহেব তো এদিকে হেসেই অস্থির। হাসির পরে কাশি আরম্ভ হয়। কাশতে কাশতে বলে—তা ছিল। কিন্তু প্রতিমাতে আর্ট আছে, এগুলোতে কি আছে মশায়? মিছামিছি ব'য়ে মরছেন কেন?

দাদা বলেন দূর থেকে পিসীমাকে দেখিয়ে দিয়ে—পিনাল কোড্‌টা বাঁচিয়ে চলছি মশায়। কারও ধর্মবিশ্বাসে খোঁচা দিতে চাই না। বড় ভক্তি আর বিশ্বাস পিসিমার কিনা, তাই। আমারও আছে খানিকটা, তবে এটার নেই একেবারে। আমাকে লক্ষ্য ক'রে দাদা বলেন, এ

একবারে নাস্তিক, কেবল ইতিহাসের ধামাধরা গোলাম। আমি বাধা দিয়ে বলি, না না সাহেব, বিশ্বাস করবেন না ওঁর কথা। কি, পরীক্ষা দিতে যাবার সময় দেখ নি ফুল-বেলপাতা কানে গুঁজি নি প্রত্যেকবার?

ঘরের ভিতর তুমুল হাসির রোল পড়িয়া যায়। অবিনাশ ফলের রস পান করিয়া হাসিতে হাসিতে শুইয়া পড়েন। নিবারণ রাণুকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। বড় সুন্দর মুখখানি রাণুর, গোলাপফুলের মত যেন।

ওই যে গাড়ি, ওই যে রেলগাড়ি!—ছেলেমেয়ে কোলাহল করিয়া উঠে—গাড়ি আসছে, মা, রেলগাড়ি। রাণু নিবারণের কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া জানালার দিকে ছুটিয়া যায়। চারিটা বাজিল, ট্রেন আসিতেছে, অবিনাশ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নিবারণের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করেন, স্টেশনে কে গেছে নিবারণ?

তেওয়ারীকে সঙ্গে ক'রে দত্ত মশায় গেছেন। সব ঠিক আছে। ওঁরা এসে থাকলে কোনই অসুবিধা হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

নীচ থেকে একটু আসি দাদু।—বলিয়া বউদি নীরদা ঠাকুরাণীর সহিত নীচে নামিয়া যান।

অবিনাশ চোখ বুজিয়া আছেন। কেমন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। ঘড়ির কাঁটার টক্ টক্ শব্দটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ কোথা হইতে একটা টিকটিকি ডাকিয়া উঠে। চোখ মেলেন বৃদ্ধ। চোখে মুখে আশা আনন্দ ফুটিয়া উঠে। উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, তারা আসবে নিবারণ। দেখো তুমি, নিশ্চয়ই তারা আসবে। আমার মন বলছে যেন।

নিবারণও উৎসাহিত বোধ করে, আশ্বাস দিয়া বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় তাঁরা আসবেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না। অবিনাশ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকেন। মনে হয় কাহার পায়ের শব্দ শুনিবার জন্য তিনি যেন কান পাতিয়া আছেন। কাহার জন্য যেন নূতন করিয়া প্রতীক্ষা

করিতেছেন আজ। নিবারণ মনে মনে ভাবে ইহাকেই বোধ হয় বার্ধক্য বলে।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বউদি বলেন, আমার কিন্তু মনে হয় দিদিমা, ওঁরা আসবেন না।

দিদিমা নীচু গলায় বলেন, আসবে কেন? উনি কি কখনও জীবনে তাদের খোঁজ খবর নিয়েছেন যে তারা আসতে যাবে! অথচ ওঁর নাতি-নাতনী, ওগো তোমার এই রেণু আর বীণা—সব সময়ই তো তারা খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ওঁর সম্বন্ধে গঙ্গাধরের কাছে কত চিঠিই না লিখেছে, দেখবে?

দিদিমা বসিতে আসন দেন। বসিতে বসিতে গৌরী বলেন, আপনি না থাকলে কি যে হ'ত।

মতির মা, ও মতির মা, ছোট বাবুকে ডেকে আন তো একবার। পুজোর সন্দেশ মিষ্টি সব প'ড়েই রয়েছে। ওবেলা যে ভাবে খেটেছে আর যা খাইয়েছি! দুপুরে পেটই ভ'রে নি হয়তো। হ্যাঁ, কি বলছিলে ভাই, আমি না থাকলে? কপালে হাত দিয়া দেখাইয়া দিদিমা বলেন, আমারও তো একটা থাকবার জায়গা চাই, তা না হ'লে স্বামী পুত্র হারিয়ে শোকতাপ পেয়ে মেয়ের কাছে গেলাম, একমাত্র মেয়ে—আদর ক'রে ডেকেও নিল। ভেবেছিলাম আর আবদ্ধ হব না সংসারে, মায়া কাটিয়ে ফেলি এবার। কাশী-বৃন্দাবনে গিয়ে কাটাই শেষ জীবনটা, শান্তি পাব। কিন্তু ভাবলাম এক, আর হ'ল এক। এই যে এস ভাই, এস। ব'স।

শচীনকে বসিতে বলিয়া দিদিমা জলযোগের ব্যবস্থা করেন। বউদির সঙ্কোচ প্রায় কাটিয়া গিয়াছিল, তিনি কোন আপত্তি করেন না।

জীবনে কত দাগাই না পেলাম ভাই, আর কতই না দেখলাম! এর চেয়ে বিয়ে-থা না ক'রে মাস্টারি করা ঢের ভাল ছিল। ম'রে স্বর্গে

গেছেন, নিন্দে করতে নেই।--উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলেন, তিনি কি কম জ্বালিয়েছেন! হাড়গোড় জ্ব'লে গেছে একেবারে, কিন্তু আর না। থামিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে থাকেন, যতদিন কিছু দিতে পারবে, তা গায়ে গতরে খাটা খাটুনিতেই বল আর টাকা-পয়সাতেই বল, কিছু দিতে পারবে যতদিন, ততদিন আদর। না দিতে পারলেই আদর ফুরুল। ঝাঁটা মার সংসারের কপালে। এর চেয়ে একা একা থাকা ঢের ভাল।—দিদিমা বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া থামিয়া যান। তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করেন, আরও আশ্চর্য দেখ, একমাত্র মেয়ে—সেও ভুলে গেল। কেমন সংসার নিয়ে মেতে পড়েছে, পরকে আপন ক'রে নিয়ে। জন্তু জানোয়ারও যা মানুষও তা, কি বল ভাই? আসল কথা হচ্ছে, সংসারে সবাই যেন একা একা নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত, সে মানুষই হোক আর শেয়াল কুকুরই হোক। মানুষের বুদ্ধি বেশি, একটু মনে রাখতে পারে বেশি, তাই পরিবেশটা সে ভুলতে পারে না সহজে, একটু আধটু মনে রাখে আর পশু তা পারে না, এই যা তফাত। কি বল?

বউদি মাথা নাড়িয়া সায় দেন।

থাক্, ওসব কথা এখন—যা বলছিলাম। দিদি মারা যাবার পরের বছরই আমি বিধবা হই। কর্তা সাপের কামড়ে মারা যান। বলতে গেলে ওঝারাই এক রকম মেরে ফেলে। দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। শচীন জিজ্ঞাসা করে, কি রকম?

চাটুজ্জে-বাড়ি থেকে সেদিন রাত্রিতে দাবা খেলে ফিরছিলেন তিনি। একটু রাতই হয়েছিল, তার ওপর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এমন সময়—

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া দিদিমা থামিয়া যান। নাক ঝাড়িয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলেন, তাড়াতাড়ি পৈতে দিয়ে তাগা বেঁধে ফেলেছিলেন, বিষ ওপরের দিকে উঠতে পারে নি তখনও। বাড়িতে এসে আরও ভাল ক'রে বাঁধা-ছাঁদা হ'ল। তারপর নাকি সব মস্ত বড়

বড় ওঝা এল, নামকরা ওঝা। সারা রাত ধ'রে ঝাড়ফুঁক কত কি হ'ল! শেষ-রাত্রের দিকে ওঝারা বললে, বিষ নেই, তাগা খুলে দিতে পারা যায় এবার। যেই না বাঁধন খুলে দেওয়া, ব্যস, অমনি ঢ'লে পড়লেন তিনি। আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলেন, যত সব অজমূর্খের দল। ঝাড়ফুঁকে আবার বিষ নষ্ট হয় না কি? জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ হ'লে তবে হয়তো বা কথা ছিল। যাক ওসব কথা। দিদি যখন মারা যান, শশধর তখন বারো-তের বছরের হবে বোধ করি। মজুমদার মশায় শশধরকে নিয়ে ভুলে থাকেন। নিজে পড়ান শোনান, কাছে নিয়ে শুয়ে থাকেন। দু-তিন বছর পরে পড়াবার জন্যে পাঠিয়ে দেন কলকাতায়। বন্ধু রমেশ মিত্রকে একটু দেখাশুনা করবার জন্যে চিঠি লিখে দেন। একটা না দুটো পাস করবার পর রমেশবাবু গোপনেই নিয়ে যান শশধরকে তাঁর নিজের বাড়িতে, বলেন—মেসে বোর্ডিংএ বড় কষ্ট। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে, আমারই ছেলের মত। আমার কাছেই থাক। হ্যাঁ দেখ, অবিনাশের কাছে এ কথাটা প্রকাশ ক'রো না যেন। তারপর নীচু গলায় এদিক ওদিক তাকাইয়া লইয়া বলেন, রমেশবাবু ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন কিনা, তাই। কিন্তু ভাই, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই রাত্রি হয়।

শচীন বলিয়া উঠে, কি রকম, কি রকম?

দিদিমা ফিসফিস করিয়া বলেন, ওই রমেশবাবুর মেয়ে স্নেহলতাই তো বেণু-বীণার মা। বিয়ে নিয়ে সারা সংসার একদম তোলপাড় যেন।

বউদি লক্ষ্য করেন, দিদিমা মুখটা ফিরাইয়া লইয়া বেশ একটি অর্থপূর্ণ হাসি গোপন করিয়া ফেলেন।

স্টেশন হইতে ফিরিবার পথে ডাক্তারবাবুর সহিত গঙ্গাধরের দেখা হইয়া যায়। তাঁহাকে লইয়া অপরাধীর মত বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে সে। সকলের মুখই ম্লান হইয়া উঠে।

বলেছি না, আজকাল টেলিগ্রামেও কোন বিশ্বাস নেই, এখনও হয়তো বিলিই হয় নি। এত তাড়াতাড়ি যে তাঁরা আসতে পারবেন সে ভরসা আমি করি নি।—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ডাক্তারবাবু কথাগুলি উঁচু গলায় বলেন, অবিনাশ যেন শুনিতে পান।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া মুখে যথাসম্ভব প্রফুল্লতার ভাব লইয়া বলেন, চিন্তার কি আছে? ভোরের ট্রেনেও নামতে পারেন হয়তো, নইলে কাল বিকেলে এমন সময়। একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া ডাক্তার বসিয়া পড়েন।

অবিনাশ অসহায়ভাবে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকেন। তাহার পর চোখ বুজিয়া ফেলেন। শরীরের অস্থিরতা যেন একটু বেশি করিয়া প্রকাশ পায়। বন্ধ চোখের কোণ বাহিয়া দুই-এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে। নীরদা ঠাকুরাণী ও বউদি কাছে আসিয়া দাঁড়ান।

না না, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ব্যস্ত হবেন না।—কপালের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহের সহিত বলেন বউদি। বৃদ্ধ কোন সাড়া দেন না। নিবারণ জোরে জোরে বাতাস করিতে থাকে।

ডাক্তারবাবু ভাল ভাবেই জানেন যে, এ রোগের ঔষধ রাওলফিন, ভিটামিন, সপরিফিক ট্যাবলেট নহে, এ রোগের ঔষধ বেণু বীণা আর শশধর। তবুও কোন্ কোন্ ঔষধ খাওয়ানো হইয়াছে তাহার খোঁজ-খবর লইয়া রক্তচাপটা পরীক্ষা করিয়া দেখেন তিনি। তারপর ব্যাগ খুলিয়া ইনজেকশন করিতে বসেন।

কিন্তু যত আপত্তি দেখা দিল দুধ খাইবার সময়। বৃদ্ধ কিছুতেই খাইবেন না, শচীনও ছাড়িবে না। সে প্রতিশ্রুতি দিল, ভোরের ট্রেনে তাঁহারা না আসিলে সে নিজে কলিকাতায় গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। এতক্ষণে অবিনাশ যেন নরম হইলেন, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সামান্য পরিমাণে দুধ খাইলেন তিনি।

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। বৃদ্ধ শান্ত হইয়াছেন, আর কোন ভয়ের কারণ নাই। নীরব নিস্তব্ধ ঘরটি, কাহারও কোন সাড়া-শব্দ নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে—নিষ্প্রভ মলিন সন্ধ্যা।

ডাক্তারবাবু শচীনের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া যান। অবিনাশ একবার চোখ মেলেন। নিস্তারিণীর ছবিটির দিকে খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন যেন। ছবির নীচে সেতারটি ঝুলিতেছিল।

শিক্ষক নরেনবাবু ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কতীর্থ যখন দেখিতে আসেন তখন মতির মা বাতিদানে বাতি জ্বালিয়া দিতেছিল। মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছিল। অবিনাশও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা ঘরের বাহির হইতেই বৃদ্ধকে দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন।

দত্ত মশায়, আপনি ওঁর কাছে ব'সে থাকুন একটু। আমি ততক্ষণে পচুর মেয়েকে দেখে আসি একবার। এই যাব আর ফিরব।—নীচু গলায় বলে নিবারণ। তারপর আশ্বাস দিয়া বলে—না না, আর কোন ভয়ের কারণ নেই, এই তো বেশ ঘুম হচ্ছে। আর দেখুন, দু-একজনকে আজ রাত্রিতে ওঁর কাছে থাকতে হবে।

পচু, ও পচু!—আঙিনাতে দাঁড়াইয়া ডাকে নিবারণ। পচু 'এই যে বাবু' বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানি জলচৌকি হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসে। নিবারণকে প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়া হাসিয়া বলে—মায়ের আমার জ্বর খুব ক'মে গেছে মাস্টারবাবু। বেশ খানিকটা ক'মে গেছে।

তা হ'লে ইনজেকশনে ফল হয়েছে, কি বল! কই, দেখি! হুঁ, অনেক কমেছে জ্বর, একশো এখন হবে। তা বেশ, কিন্তু আর একটা ইনজেকশন দিলে ভাল হ'ত বোধ হয়। ঘুমোচ্ছে, না? ঘুমোক ঘুমোক। বরফ এনেছ?

আজ্ঞে না, জ্বরটা ক'মে যাচ্ছিল ব'লে আনি নি।

বোধ হয় আর দরকার হবে না। যাক, সাবধানে থেকো।

জ্যোৎস্না উঠিতেছে, বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া চাঁদটাকে আজও সম্পূর্ণ গোল দেখাইতেছে। তাহার নিজের গ্রামের কথা মনে পড়িয়া যায় নিবারণের। পূর্বদ্বারী ঘরের বারান্দায় বসিয়া কতদিন সে দেখিয়াছে, প্রতিবেশী কালিদাসদার ঘরের পিছনের বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া চাঁদ উঠিতেছে। এই চাঁদ নিশ্চয়ই তাহার সেই কালিগঞ্জের বাড়িটি দেখিতেছে, ভোলা হয়তো বা বড় ঘরটার বারান্দায় শুইয়া আছে। আর এখানে বসিয়া সে চাঁদটাকে দেখিতেছে। ওই চাঁদই যেন তাহাদের যোগসূত্র। চাঁদের পথ বাহিয়া নিবারণ কালিগঞ্জে পৌঁছিয়া যায়, কালিগঞ্জ তো এখনও পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া যায় নাই। ভাবিতে ভাবিতে নিবারণের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়া যায়।

পান সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করে পচুর স্ত্রী।

খুব চিন্তা হয়েছে না?—মানদাকে সম্বোধন করিয়া বলে নিবারণ—এবারে ভাল হয়ে যাবে। না না, চিন্তার কিছু নেই। পান হাতে লইয়া বলে—ভয় কি, দরকার হ'লে আমি আছি।

আপনাদের দশজনের আশীবাদ।—অস্ফুটস্বরে বলে মানদা।

আরে, আমাদের নয়, আমাদের নয়। বল, ভগবানের আশীর্বাদ।

পানটা মুখের ভিতর পুরিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে ভাবে, পচু লোকটা অত্যন্ত বদরাগী, রাগ হইলেই মারধোর আরম্ভ করিয়া দেয়। আহা, কেমন সুন্দর সহজ সরল মুখ! ইহাকে সে মারিল কি করিয়া! এই তো সব। সংসার হইতে মানদাকে বাদ দিলে পচুর কিই বা থাকে! সেই কাক ডাকিতে না ডাকিতেই ঘুম হইতে উঠা, বাড়ি ঘর দোর ঝাঁট দেওয়া। লেপামোছা, বাসনমাজা, কাপড়কাচা, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা। এইবার হালের বলদ দুইটাকে জাব খাইতে দিতে হইবে।—কি

বলছ ? তামাক ? হ্যাঁ, যাই। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে পচুর জন্য তামাক সাজিয়া দেওয়া দুই-চারিবার—এটা ওটা ফাই-ফরমায়েশ খাটা।—পান্তা খাবে, না, মুড়ি দেব ? লক্ষ্মী, মুড়ি খা তুই। পান্তা মুড়ি খাইতে দেওয়া দুইজনকে, যে যা চায়। জ্বালানি না থাকিলে কোন কোন দিন হয়তো বা নিজেকেই কুড়াল দিয়া কাঠ-বাঁশ কিছু না কিছু চিরিয়া লইতে হয়। আবার হয়তো কোনদিন—

—ওমা, চাল নেই যে, ভাঁড়ে মা ভবানী! নাঃ, আর পারি না বাপু।—বিরক্তির সহিত বলে মানদা। তারপর যেন চিন্তা করিয়া নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্য আপন মনেই বলিয়া চলে—কিন্তু, কিই বা করবে সে ? আজ দুদিন ধ'রে গোঁসাইদের জমিতে খাটছে, হাটবারে মজুরি দেবে বলেছে। ধানই কেনা হয় নাই এ হপ্তায়, তা চাল আর আসবে কোথা থেকে ? তাহার মনে পড়িয়া যায়।

—লক্ষ্মী, ও লক্ষ্মী। নাঃ, এত বড় মেয়ে হ'ল ঘরে থাকবার নামটি নাই। আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়ে ফেলল। কোন কাজ তো করতে দেবেই না, আর পাছে আমি কোন কাজ বলি সেজন্যে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছে হতচ্ছাড়ী।—মানদা বকিতে থাকে।

আরও ডাকাডাকি করিবার পর অপরাধীর মত লক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়ায় হয়তো। মানদা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বলে—ঘর ছেড়ে ফের কোথাও যাবি তো মেরে ফেলব তোকে আমি। কোথাও যাবি না কিন্তু। তারপর আবার জ্বলিয়া উঠে যেন, অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া বলে—পিণ্ডি যে ঘরে নেই, পিণ্ডির ব্যবস্থা করতে হবে না ? মানদা হনহন করিয়া বাহির হইয়া যায়। লক্ষ্মী হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকে আর ভাবে, বাবা মাঠে খাটিতে গিয়াছেন। তাঁহার জন্য ভাত জল পৌঁছাইয়া দিতে হইবে যেমন করিয়াই হউক। মা চাল ধার করিতে গেলেন।

পচু হুঁকাটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া বসে, নিবারণের কল্পনার

জালও ছিঁড়িয়া যায়। হুঁকায় একটা লম্বা টান দিয়া কাশিতে কাশিতে পচু বলে—তা হ'লে আর কোন ভাবনা নেই, তাই নয় মাস্টারবাবু? সে যেন তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। নিবারণ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়—না, ভয় কিসের! সে তখন বাড়িটির চতুষ্পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিতে ব্যস্ত—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত। একটা ভাঙা মাটির দেওয়াল দেখাইয়া নিবারণ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—পচু, ওখানে কোন ঘর ছিল না কি?

হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় কিছু রুজি-রোজগার করেছিলাম, স্বামী-স্ত্রীতে মিলে খাটা-খাটুনি ক'রে। একখানা ছোট টিনের ঘরও করেছিলাম বাবু, কিন্তু রাখতে পারলাম না। গেল সনের আগের সনে বিক্রী ক'রে দিতে হ'ল।

কেন?

লক্ষ্মীর মার চিকিৎসার জন্যে। সান্নিপত্তিক জর হয়েছিল ওর। অনেক টাকা নিয়েছে গোপাল ডাক্তার—জানেন মাস্টারবাবু, তাও তো পাস-করা নয়। শরৎ ডাক্তার আসে নি তখনও কিনা। একটু থামিয়া বলে—দিলাম বেচে। দরও ভালই পেলাম, ব্ল্যাকের দর। আর কি করতে পারব জীবনে? তারপর যেন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য যুক্তি দেখাইয়া বলে—মানুষের জীবনের কাছে আবার টাকা পয়সা বিষয় আশয়—কি বলেন মাস্টারবাবু?

নিবারণ কিছু বলে না। সে তখন ভাবিতেছিল, অতবড় একজন ধনী এবং শিক্ষিত কালিদাসদা, সেও তাহার স্ত্রীকে ধরিয়া মারধোর করে, কিন্তু পচুর মত জীবন পণ করিয়া এমনভাবে ভালবাসিতে পারে কি?

পচুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিবারণ উঠিয়া পড়ে। নানাপ্রকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সে বাড়ি পৌছিয়া যায় তাহা সে বুঝিতেই পারে না। অবিনাশের কথা ভুলিয়া যায়।

রাত্রিতে পচুর ব্যবহারে মানদার বিবাহের প্রথম দিনগুলির কথা মনে পড়িয়া যায়। আদরে আদরে ভরিয়া দিয়া পচু তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলে, দেখ লক্ষ্মীর মা, বয়স হয়ে যাচ্ছে বেশি, ছেলে একটা থাকলে সাহায্য হ'ত অনেক, তাই না? সে কথায় মানদা কেবল হাসে।

সারাদিন পরিশ্রমের পর ডাক্তারবাবু খাটের উপর শুইয়া পড়িয়াছেন। রাণু একবার খাটের উপর উঠিতেছে আর একবার নামিতেছে। একবার হয়তো বা তাহার বাবার বুকের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে। চায়ের জল উনানে চাপাইতে চাপাইতে বউদি বলেন, তা হ'লে আপনারা এই দুই ভাই, না, আরও ভাই বোন আছে?

আমি নিবারণদার আপন ভাই না কিন্তু বউদি। দাদা একা, দাদার আর কোন নিজের ভাই বোন নেই।—শচীন কথাগুলি একটু অপ্রতিভ-ভাবে বলে।

তবে কেমন ভাই আপনি? খুড়তুতো জেঠতুতো, না, মামাতো পিসতুতো বুঝি?—প্রশ্ন করেন বউদি।

আরে, না না, তাও না। দাদা ব্রাহ্মণ আর আমি হচ্ছি কায়স্থ।

সে কি!—বউদি আশ্চর্য হইয়া যান। অবিশ্বাসের সহিত শচীনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। ডাক্তারবাবুও বিস্মিতভাবে উঠিয়া বসেন, বলেন, বেশ মজা তো! আমিও তো জানি ওঁরা দুজন দুই ভাই। বউদিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, দুজনের যা ভাব, না জানলে বোঝবার উপায় নেই, তাই না গৌরী?

বউদি তবুও যেন বিশ্বাস করেন না কথাটা, হাসিয়া বলেন, না না, ঠাট্টা করছেন আপনি।

ঠাট্টা নয়, শুনুন তবে। শচীন বলিতে থাকে—দাদার বাবা বিধুশেখর চক্রবর্তী মশায় যখন মারা যান তখন দাদার বয়স বারো কি তেরো।

শিশু অবস্থাতেই মা মারা যান। বাড়িতে পিসিমা পিসেমশায় থাকতেন, তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। বলা যেতে পারে পিসিমার কোলেই দাদা মানুষ হয়েছেন। পিসেমশায় গত হয়েছেন এই হ'ল গিয়ে দশ বছর।

রতনপুর ইস্কুলে নবম কি দশম শ্রেণীতে পড়বার সময় দাদা গোপনে গোপনে বিপ্লবীদের দলে ঢুকে পড়েন। এর কিছুদিন পরেই পাটা ফেলেন ভেঙে।—কথা বলিতে বলিতে শচীন হাসিয়া ফেলে।

কি ক'রে? ও কি, হাসছেন কেন?—প্রশ্ন করেন বউদি। কেটলিটা নামাইতে নামাইতে বলেন, ও, তাই একটু খোঁড়া। আমি ভেবেছিলাম জন্ম থেকেই বুঝিবা এমন।

কালিগঞ্জে দাদার বাড়ি থেকে একটু দূরে নদীর ধারে জমিদারদের একটি অতিথিশালা আছে। পাকা বাড়ি, কিন্তু অনেক দিনের পুরনো। সেখানে সদর থেকে এক পুলিস সাহেব কালিগঞ্জ থানা দেখতে এলেন—লঞ্চে ক'রে বর্ষাকালে। দাদাদের বিপ্লবীর দল ঠিক করলেন, সাহেবের রিভলবারটা চুরি করতে হবে তাঁদের সমিতির কাজের জন্যে।

প্ল্যান ঠিক হ'ল, রীতিমত মহড়া হ'ল দলে। তারপর অন্ধকারের ভেতর তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন কালো কালো প্যাণ্ট প'রে আর কোমরে সব অস্ত্রশস্ত্র বেঁধে নিয়ে।

বউদি যেন ভয় পাইয়া যান, চোখ বড় বড় করিয়া বলেন, কি সর্বনাশ! কি সাংঘাতিক ছেলে এরা সব! এদের প্রাণে ভয়ডর ব'লে কিছু নেই না কি?

তুমিও ভাল। তাদের আবার প্রাণের মায়া ছিল নাকি কোনদিন?—ডাক্তারবাবু বলেন, তারপর শচীনবাবু?

দোতলার স্নানঘর-পায়খানা থেকে নীচের দিকে একটা কাঠের সিঁড়ি ছিল, বাইরে থেকে মেথর আর ঝাড়ুদারদের নামাওঠা করার জন্যে। সিঁড়ির দরজাটা সাধারণত ভেতর থেকে বন্ধ থাকত, কিন্তু তার পাশেই

ছিল একটা জানলা, তাতে গরাদে ছিল না, শুধু ছিল কাচের সার্সী। আর সেটা বেশির ভাগ সময় খোলাই থাকত। স্বমুখ দিয়ে ঢোকা যাবে না, পাহারা ছিল। ঠিক হ'ল জানলা দিয়ে ঢুকতে হবে। সিঁড়ির মুখে আলসে দিয়ে খানিকটা গেলে তবে জানলা। সে কি সোজা কথা!—কথা বলিতে বলিতে শচীন যেন উত্তেজিত হইয়া উঠে, সে থামিয়া যায়।

আচ্ছা বল তো, এদের কি দুর্জয় সাহস! এ যে একদম রূপকথার মত লাগছে আমার কাছে।—চা ঢালিতে ঢালিতে বউদি বলেন, তারপর? থামলেন কেন? ব'লে যান, শুনতে বড় ভাল লাগছে।

হ্যাঁ, রাত খুব বেশি না হ'লেও দেখা গেল, পুলিস সাহেব মশায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। রিভলভারটা একটা ব্র্যাকেটে ঝুলছে, খুঁজতে হ'ল না। দাদা সেটাকে নিয়ে নিলেন, কিন্তু ফেরবার সময়ই যত সব গোলমাল হয়ে গেল।

ধরা প'ড়ে গেলেন বুঝি?—বউদি বলিয়া উঠেন।

না না, তা কেন? শুনুন। আলসে ছিল পুরনো, লোনাধরা বোধ হয়। অনেক দিনের বাড়িটা তো। ভেতরে ঢোকবার সময় কোন আপত্তি করে নি সে, সহ্য করেছে সব, কিন্তু বের হবার সময় আপত্তি করল। শুধু আপত্তি করা নয়, একদম বিশ্বাসঘাতকতা। নিজে তো ভেঙে পড়লই, দাদাকে শুদ্ধু ভেঙে ফেলবার উপক্রম আর কি!

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে। বউদি চা পরিবেশন করেন। নিজে সামান্য একটু চা লইয়া কাছে আসিয়া বসিয়া বলেন, তারপর?

তারপরে কি হয়েছিল তা ব'লে বোধ করি ভালভাবে বোঝানো যাবে না। আলসেটা ভেঙে পড়তে না পড়তেই নিমেষের মধ্যে ঝাঁপ দেবার মত ক'রে সিঁড়িতে ওঠবার কাঠের রেলিংটা ধ'রে ফেললেন দাদা। কাঠ-বাবাজীও প্রাচীন ও বৃদ্ধ ছিলেন, ভার সইতে পারলেন না। দাদাকে

শুদ্ধ সঙ্গে ক'রে ভেঙে পড়লেন নীচে। সম্পূর্ণ চাপটা কাঠের ওপর গিয়ে পড়াতে দাদা আঘাত পেলেন কম, মাত্র একটা পা নষ্ট হ'ল। রেলিংটা তার জীবন দিয়ে দাদাকে বাঁচাল।—এই বলিয়া গম্ভীরভাবে চায়ের কাপে চুমুক দেয় শচীন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বউদি বলেন, বাঁচলাম বাপু! যে সব দস্যি ছেলের দল! ডাক্তারবাবু ঠাট্টা করিয়া বলেন, তোমার তো দেখি খুব ভয়। যেমনভাবে নিশ্বাস বন্ধ ক'রে গল্পটা শুনছিলে তা দেখে মনে হ'ল, ঘটনাটা তুমি যেন চোখের সামনে দেখছ। ভয় নেই গৌরী, নিবারণবাবু বেঁচেই আছেন।

ঘরের ভিতর পুনরায় হাসির রোল পড়িয়া যায়। হাসি থামিলে শচীন বলে, সকলে মিলে কাঁধে ক'রে পাঁচ মাইল দূরে রতনপুরে সরিয়ে ফেলা হ'ল সঙ্গে সঙ্গে; দাদা তখন অজ্ঞান। খুব গোপনে চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল, কিন্তু অনেক দিন ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন দাদা, বরাবর প্রথম হয়ে হয়ে উঠেছেন ইস্কুলে, কিন্তু এই সব কাজের মধ্যে মিশে পড়াশোনার ক্ষতি ক'রে ফেললেন। পরীক্ষাতে বৃত্তি পেলেন না, সকলেই কিন্তু আশা করেছিল।

তারপর শচীন আরও বলিয়া চলে, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, তার ওপর আবার বাপ মা নেই। রাজসাহীতে এক জ্ঞাতি খুড়োর কাছে থেকে কলেজে পড়তে গেলেন। প্রথমে তিনিও খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু শেষে যখন দাদার কীর্তিকলাপ সব জানতে পারলেন তখন একদিন গোপনে ডেকে বললেন, নিবারণ, আমার ভয় হচ্ছে পাছে তোমার জন্যে আমাকে পুলিসের কুনজরে পড়তে হয়। হয় তুমি এ সব ছাড়, আর না হয় অন্য কোন জায়গা দেখে নাও। পুলিস কিন্তু দাদাকে কোনদিন ধরতে পারে নি, জানেন বউদি?

শচীন বউদির মুখের দিকে তাকাইতেই বউদি বলিয়া উঠেন, তারপর?

কি করবেন, উপায় তো নেই। অন্য একটা বাসা ঠিক ক'রে নিলেন দাদা। কিন্তু আর পড়াশোনা হ'ল না। ওই যা কোন রকমে আই. এ. পরীক্ষাটা দিলেন।

কেন ?

পিসেমশায় মারা গেলেন। দাদা পিসিমাকে ফেলে রেখে বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও গেলেন না।—চায়ের কাপ নীচে রাখিতে রাখিতে শচীন বলে, এর কয়েক বছর পরেই যুদ্ধ লেগে যায়। পিসিমা বললেন, একটা কিছু কর। উপার্জনের পথটা দেখ এবার। এখন তো বড় হয়েছ, একটা ছোটখাট ব্যবসাও তো করতে পার। এমন ভাবে মড়া পুড়িয়ে, রোগী ঠেলে, ছেলে পড়িয়ে, বেগার খেটে আর কতদিন চলবে, শুনি ? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো এখন বন্ধ কর।

পিসিমার কিছু টাকা পয়সা গহনাগাটি ছিল, তা থেকে আর দু-চার বিঘা জমিজমা বিক্রি ক'রে সেই টাকা নিয়ে দাদা সুতো আর কাপড়ের ব্যবসা শুরু করলেন, একদম লক্ষ্মী ছেলের মত। কালিগঞ্জের বাজারে দোকান হ'ল। পাশাপাশি গ্রামগুলোতে অনেক তাঁতি ছিল কিনা, তাই দেখতে দেখতে দোকানটাও জ'মে উঠল। যুদ্ধের সময় উঠতির বাজার, পর পর সুতো কাপড়ের দর বেড়েই চলেছে। বললে বিশ্বাস করবেন না বউদি, দু বছর, মাত্র দু বছরের মধ্যেই দাদা বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা লাভ ক'রে ফেললেন।

কিছু দিনের মধ্যেই আগস্ট আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। দাদার মুখে চোখে ব্যথা-বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে। একদিন খেতে ব'সে বললেন, পিসিমা, খেতে কষ্ট হয় বড়। আমি যখন খেতে বসি তখন মনে হয়, কারা যেন লক্ষ লক্ষ কঙ্কালসার হাত তুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার কষ্ট হয়, আমি নিজেকে নিয়ে বড় বেশি মেতে পড়েছি। চুলোয় যাক ব্যবসা, নূতন অধ্যায় শুরু করতে হবে এবার, জীবনের নূতন অধ্যায়।

নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। দাদা মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন সব রকম বিলাসিতা ছেড়ে দিলেন তিনি। সংগ্রাম চালাবার জন্য সংঘ গ'ড়ে উঠল। আমাদের কালিগঞ্জের বাজার থেকে কত চাঁদাই না তুললেন দাদা!

রতনপুরে সংঘের প্রধান কার্যালয় হ'ল; গোপনে টাকা পয়সা জমা দিতে যেতেন সেখানে। এখানেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়।

একটু থামিয়া শচীন বলিয়া চলে, দাদা বোর্ডিংএ এসেছিলেন। নাম শুনেছি অনেক বার, দেখি নি কখনো তার আগে। সেপ্টেম্বর মাস, তখন পর্যন্ত একখানা দরকারী বই কিনতে পারি নি টাকার অভাবে। ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে বলি, দাদা, একখানা বই না হ'লে চলছে না, একখানা বই দরকার। দাদা শুনে হেসে বলেন, বই কিনবে? আচ্ছা, তা কিনবে। মতিবাবু কাছে ছিলেন, বললেন, মনে নেই নিবারণবাবু? সেই যে সেদিন বলেছিলাম? এই সেই শচীন। একটু চেষ্টা-চরিত্তির করলে ছেলেটা ভাল হ'ত, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে ওর কেউ নেই—বই কেনবার পয়সাটা পর্যন্ত যোগাড় করতে পারে না।

বলিতে বলিতে শচীন থামিয়া যায়। থামিয়া গিয়া বলে, এর পর থেকে দাদার কাছে শুনবেন, নিজের কথা নিজের বলতে নেই।

বউদি বাধা দিয়া বলেন, তাতে আর হয়েছে কি? আপনি ঘটনাটা যা ঘটেছিল তাই বলছেন, নিজে তো আর কিছু তৈরি ক'রে বলছেন না।

ডাক্তারবাবু বলেন, বলুন না শচীনবাবু, তাতে আর দোষ কি?

বাধ্য হইয়া শচীনকে বলিতে হয়, আমার আর মাস্টার মশায়ের কথা শুনে দাদার মনে যেন ব্যথা লাগল। মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কেউ নেই? মতিবাবু উত্তর দেন, একমাত্র এক বুড়ো দাদামশায় আছে, তাই না রে শচীন? তারপর বলেন, মাইনরে বৃত্তি পেয়েছে, এখানে ইস্কুল বোর্ডিং সব ফ্রী। উত্তর না দিয়ে অন্য কাজে চ'লে গেলেন

দাদা। বাড়ি ফেরবার সময় আমার কাছে এসে বললেন, চল শচীন, পিসিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে। আমি তো অবাক্।

কালিগঞ্জে গিয়ে পিসিমাকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াই। দাদা পিসিমাকে বলেন, আমার ছোট ভাই নেই। টাকা পয়সা, থাকবার জায়গা যোগাড় করতে পারি নি ব'লে আমি মনের সাধ মিটিয়ে লেখাপড়া করতে পারি নি। বড়লোকের ছেলেরা যখন সব নতুন নতুন বই পড়ত, তখনও আমি পুরনো বই খুঁজে বেড়াতাম। ভাল ভাল জামা কাপড় প'রে ওরা ইস্কুলে আসত, আর চাকরের হাতে আসত জলখাবার। খিদের সময় পেট ভ'রে খেতে পেত। ভাল খাওয়া, ভাল পরা আমার কোনদিনই জোটে নি। দুঃখ হ'ত না, চোখে লাগত শুধু। পিসিমা, তাই শচীনকে নিয়ে এলাম। আমার সেই সব ইচ্ছা যা সেদিন মেটাতে পারি নি, তা এই শচীনের ভিতর দিয়ে মেটাব।

সব কিছু বুঝতে পারি নি তখন, পরে বুঝেছি। সঙ্কুচিত হয়ে বলেছিলাম আমি, আপনার দয়া। আমার দিকে তাকিয়ে দাদা বলেছিলেন, সচ্ছলতার সংস্পর্শে এসে তুমি বিপথে চ'লে যাবে না তো? মাথা নীচু ক'রে বলেছিলাম, না। তিনি বলেছিলেন, তুমি যাতে মানুষের মত মানুষ হতে পার, তার জন্যে আমি সাহায্য করব তোমাকে, সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। কিন্তু মনে রেখো, আমাদের এই গরীব দেশের সেবার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্যে আমার এই স্নেহ। পিসিমাকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, ভাল গাছের চারা পাওয়া গেছে একটা, অন্তত লক্ষণ তো তাই দেখা যাচ্ছে। জল ঢালি, আদর করি—ফল পাবে লোকে। পিসিমা হেসে বলেছিলেন, বেশ তো। তোর যখন এত শখ, থাকুক না।

বউদি, সেই দাদা আমার। আমার মনেও হয় না যে, আমার নিজের দাদা নয়।

শচীনের কথায় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। দাঁড়াইয়া বলে, আজ আসি, কেমন? অনেক রাত হয়ে গেল। আমাদের বাসায় একদিন বেড়াতে যাবেন বউদি। আসি ডাক্তারবাবু, নমস্কার।

ডাক্তারবাবু হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করেন। দাদার কথা আলোচনা করিয়া শচীন যেন মনের ভার লাঘব করে। চলিতে চলিতে ভাবে, বউদিকে একটি কথা বলা হয় নাই। কলিকাতায় গিয়া দাদা সেদিন দেখিয়া আসিয়াছেন, দাদাদের বিপ্লবী দলের সেই নেতা মহাশয় এক মেসে মাতাল অবস্থায় জুয়ার আসরে বসিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি নানা প্রকার চোরা-কারবার করিয়া আজকাল প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই পিসিমা ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন, কি রে, বুড়োর ছেলে নাতি নাতনীরা এল সব?

না, আসে নি।—গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয় নিবারণ, আমিও তাই ভেবেছিলাম, ওরা আসবে না। বুড়োর কি শক্ত প্রাণ, দেখ! এত দিনের ভেতর একবারও তাদের আসতে বলে নি। সেকালের লোক কি না, তাই। একালে তো সব কিছুই চলে।

কথা শেষ করিতে না দিয়া নিবারণ বলে, মুস্কিল তো ওইখানেই পিসিমা। সেকালে যদি একাল থাকত তবে তো গণ্ডগোলই হ'ত না। তখনকার দিনের একাল আজকার দিনের সেকাল হয়ে গেছে। একাল থেকে কবে যে ধীরে ধীরে সে নিজেই সেকাল হয়ে গেল, তা বুঝতে পারে নি। আজকার এই যে একাল, সেও সেকাল হয়ে যাবে একদিন। একালের সঙ্গে সেকালের যে মুখোমুখি দেখা হচ্ছে না কিছুতেই, সে সম্ভাবনাও নেই। একজন অপর জনের পিছনে রয়েছে যে।

কথাগুলি বুঝিতে না পারিয়া পিসিমা জিজ্ঞাসা করেন, কি রকম?

দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্যে। কাব্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে মানুষ পৃথিবীর প্রত্যেক যুগের ছবিকে, সমাজের ছবিকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করছে। পরিবর্তন সে চায় না। কিন্তু আটকাতে পারছে না, মন তার বদলে যাচ্ছে। সময় আর পারিপার্শ্বিকতা তার মনের ওপর পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। সময় যে গতিশীল পিসিমা। এখনকার এই মুহূর্ত পরের এক মুহূর্তের সঙ্গে তো এক নয়। পরিমাপে সমান হ'লেও সময়ের গতি-পথের ওপর তাদের অবস্থানের পার্থক্য রয়েছে যে।

আমি ওসব কথা কিছু বুঝি না ছাই। আমি ভাবি, নীরদা ঠাকরুণ না থাকলে বুড়োর কি দশাই না হ'ত! পনের বছর ধ'রে ওঁর সেবা করছেন। বললেন, পঞ্চাশ বছরে এসেছিলাম, এই পঁয়ষট্টি হ'ল।

তারপর নীচু গলায় বলেন পিসিমা, বুড়োর সংসারে আসবার আগে ঠাকরুণ মেয়ে-জামাইয়ের কাছে ছিলেন। শোকতাপে শরীরটা ভেঙে পড়েছিল। দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, প্রথম কয়েক বছর ভালভাবে কাটল। তারপর শরীরটা ভেঙে পড়তেই খিটিমিটি শুরু হ'ল মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে; তারা যেন গলগ্রহ মনে করতে লাগল। ভাবলেন, মানে মানে স'রে পড়াই ভাল, দূর থেকে ওরা ভাল থাকে জেনে সুখী হবেন। নিশ্চিন্ত মনে ঠাকুরসেবা করতে পারবেন—এই আশায় এখানে চ'লে এসেছেন। আর বুড়োরও সব থেকেও দেখবার কেউ নেই।

একটু থামিয়া পিসিমা বলেন, ঠাকরুণ খুব ভয় পেয়ে গেছে। তা ভয় পাবার কথাই তো। বাসায় ফেরবার সময় আমাকে বলছিলেন, যাদের জিনিস আগলে রাখলাম এতদিন, তারা এলে তাদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম।

পিসিমা জপ করিতে চলিয়া যান। নিবারণ শুইয়া পড়িয়া খবরের কাগজ দেখিতে থাকে। ইতিমধ্যে শচীন বাসায় ফিরিয়া আসে, জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলে, দাদা, ডাক্তারবাবুর বাসা থেকে ফেরবার

পথে মজুমদার-বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলাম, বুড়ো কেমন আছে! সেই সন্ধ্যা থেকে ঘুমোচ্ছে এখনও।

এখনো ঘুমোচ্ছে না কি? যাক, বাঁচা গেল।—খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলে নিবারণ। তারপর মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া শচীনকে বলে, কাগজটা দেখেছিস শচীন? পূর্ববঙ্গের অবস্থা আবার যে খারাপ হতে আরম্ভ করেছে রে।

তাই নাকি? দেখি দেখি!—হাত পা মুছিয়া শচীন নিবারণের কাছে শুইয়া পড়ে, হাত হইতে খবরের কাগজখানা লইয়া সে পড়িতে থাকে—ঈস্ট বেঙ্গল সিচুয়েশন ডেটিরিওরেটেস্। সংবাদটা পড়া শেষ হইলে নিবারণ যেন একটু দ্বিধার সহিত বলে, শচীন, এই শচীন, আজ রাতে তুই বুড়োর কাছে থাকবি, বুঝলি? আমার শরীরটা বড় ভাল লাগছে না। শোন্, তোর তো আবার নিজের জিনিস না হ'লে ঘুম হয় না। বিশেষ কিছু না, একটা মশারি বালিশ সতরঞ্চি আর একখানা চাদর সব জড়িয়ে বগলে ক'রে নিয়ে যাবি।

শচীন কাগজ পড়িতে পড়িতে বলে, আচ্ছা!

উঃ! মা! মা গো! জল! একটু জল!

ঘুম ভাঙিয়া যায় মানদার, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কেরোসিনের ডিবাটা ধরাইয়া দেয়।

কি? কি মা? কি হয়েছে মা?—মানদা মেয়ের মাথায় হাত দিয়া বলে।

জল, জল খাব। উঃ, মা গো, যন্ত্রণা!—মাথার দিকে হাতটা দিয়া কি যেন দেখায় মেয়ে।

সে কি! গা এত গরম কেন?—মানদা লক্ষ্মীকে জল খাওয়ায়। দুই ঢোক গিলিয়া মুখ সরাইয়া লইয়া লক্ষ্মী পাশ ফিরিয়া শোয়।

উঃ, শরীরটা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! কি হবে উপায়? ভয় পাইয়া পচুকে ডাকে মানদা—ওগো শুনছ, শুনছ? পচু ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসে, চোখ বড় বড় করিয়া বলে, কি হয়েছে? কি হয়েছে? তারপর গায়ে হাত দিয়ে বলে, সে কি! এই তো মেয়ের জ্বর ছেড়ে যাচ্ছিল! চোখও তো খুব লাল, আর খুব যেন অস্থির হয়ে পড়েছে দেখছি! ভয়ে পচুর প্রাণ উড়িয়া যায়।

মা, মা গো!—

পচু ডাকে—কি মা? কি কষ্ট মা? লক্ষ্মী একবার তাকাইয়াই পরমুহূর্তে চোখ বন্ধ করিয়া ফেলে, কোন উত্তর দেয় না। শুধু ইশারা করিয়া মাথা দেখাইয়া দেয়। মানদা কাঁদিয়া ফেলে, সে তাড়াতাড়ি মাথায় জল ঢালিতে বসে।

তুই জল দে মাথায়, আর কাঁদিস না। দেখ্, কাঁদিস না, মেয়ে ভয় পাবে। আমি ততক্ষণে মাস্টারকে ডেকে আনি, রাতও বেশী নেই। পচু ঊর্ধ্বশ্বাসে নিবারণের বাসায় ছুটিয়া যায়।

মাস্টারবাবু, মাস্টারবাবু, ও মাস্টারবাবু!

কে? পচু?—নিবারণ খিল খুলিয়া বাহির হইয়া বলে, কি খবর পচু?

মাস্টারবাবু, মায়ের জ্বরটা খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে, একেবারে ছটফট করছে। চোখও লাল।—ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় পচু যেন মুষড়াইয়া পড়ে। ইতস্তত করিয়া বলে, ভাতটা খেতে দিবার জন্যই কি—

নিবারণ ধমক দিয়া বলে, ফের ও-কথা? কটা ভাত ও খেয়েছিল শুনি? পচু চুপ করিয়া যায়।

চোখ লাল, না?—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিবারণ চিন্তিতভাবে বলে, চোখ লাল। বরফ তো আন নি। ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছ?

আজ্ঞে না—অপরাধীর মত বলে পচু, তখন একটু ভাল দেখলাম কি না, তাই।

তোমাদের তো ওই দোষ। তারপর ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া নিবারণ বলে, দেখ, চারটের ট্রেনটা এখনই আসবে, চেষ্টা করলে তাতে বোধ হয় বরফ পেতে পার। ছুটে যাও, ডাক্তারবাবুকে সংবাদ দিয়ে :গাড়ী থেকে বরফ কিনে নিয়ে সটান বাড়ী চ'লে যাবে। আমি তোমার বাড়ী যাচ্ছি। টাকা আছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যাও, অস্থির হ'য়ে পড়ো না এখন।

সব কিছু শুনিবার পর ডাক্তারবাবু মুখখানা গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, বরফ কি এনেছিলে ও-বেলা?

আজ্ঞে না, তবে এখনই একটা গাড়ী আসবে। যাই, দেখি যদি পাওয়া যায় তাতে!

যাও যাও, এক্ষুনি যাও।—তাড়া দিয়া ডাক্তার বলেন, বরফ চাই, বরফ দরকার। আমি তোমার বাসায় যাচ্ছি, তুমি বরফ নিয়ে এস।

প্রথম ঘণ্টা পড়িয়াছে মাত্র, গাড়ী আসিতে কিছু দেরি আছে এখনও। পচু মনে মনে ভাবে, রেলগাড়ীর কোথায় বরফ পাওয়া যায় তাহা তো সে জানে না। অতবড় গাড়ীতে কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিবে আর কে বা বরফের সন্ধান দিয়া দিবে? খোঁজ করিতে করিতে সে যদি জায়গা মত পৌঁছাইতে না পারে তখন কি উপায় হইবে? পচু যেন ভয়ে শিহরিয়া উঠে। বাবুলাল জমাদারকে সম্মুখে পাইয়া ডাকে, জমাদার, ও জমাদার ভাই, শোন।

বাবুলাল পিছন ফিরিয়া বলে, কে? পচু না কি?

হ্যাঁ জমাদার, বলতে পার গাড়ীতে কোথায় বরফ পাওয়া যায়?—এক নিশ্বাসে প্রশ্ন করে পচু।

বরফ! কি হবে বরফ দিয়ে?

মেয়েটার বড় অসুখ ভাই। জ্বরে একদম ছটফট করছে যেন। ডাক্তার বলেছেন মাথায় বরফ দিতে হবে, তাই—। অনুরোধ করিয়া বলে, জমাদার, আমাকে একটু বরফ যোগাড় ক'রে দাও না?

জমাদার কথাটায় আমল না দিয়ে বলে, আমার নিজের কাজ আছে বাপু, মালপত্তর অনেক। আমি পারব না। আমার এখন মরবার সময় পর্যন্ত নেই।

পচুর মাথায় যেন বাজ পড়ে, প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলে, জমাদার, দোহাই তোমার! দেখ, মেয়েটা বরফ না পেলে ম'রে যাবে। গেঁয়ো মানুষ, গাড়িতে কোথায় বরফ পাওয়া যায় জানি না তো, তাই তোমাকে বলছি। তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমাকে একটু দেখিয়ে দাও। পচু বাবুলালের পা জড়াইয়া ধরিতে যায়। তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া বাবুলাল বলে, আরে আরে, পাগল নাকি? থামিয়া মুখ ফিরাইয়া বলে, ট্রেনে যা বরফের দাম!

কত?—প্রশ্ন করে পচু।

টাকা টাকা সের, জানিস? তাও যাকে-তাকে দেয় না।

তা জানি। আর দাম যাই হোক ভাই, আমাকে বেশি নয়, দু সের বরফ কিনে দাও। আমি চাইলে তো আমাকে দেবে না। তোমাকে নিশ্চয় দেবে, তোমার সঙ্গে ওদের কত জানাশোনা আর ভাব!

দাঁওটা ছাড়া ঠিক হইবে না মনে করিয়া বাবুলাল একটু নির্লিপ্তভাবে বলে, আমি তো যোগাড় ক'রে দেব, আমাকে কি দিবি বল্?

তিনটি টাকা সম্বল ছিল পচুর। দুই টাকা বরফের জন্য খরচ হইলে এক টাকা বাকি থাকে। সে বলিয়া ফেলে, তোমাকে? তোমাকে এক টাকা দেব।

দুঃ, এক টাকাতে কি হয়? বরফওয়ালাকে দিতে হবে না? বরফের দাম তো কোম্পানি পাবে। না না, আমি পারব না বাপু। তুমি

পথ দেখ।—বাবুলাল চলিতে শুরু করে। গাড়ি আসিবার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িয়া যায়।

পচু হতাশ হইয়া বাবুলালের পিছনে পিছনে হাত কচলাইতে কচলাইতে চলিতে থাকে, মিনতি করিয়া বলে, শোন জমাদার, শোন। আমার কাছে টাকা পয়সা আর নেই যে এখন, থাকলে দিয়ে দিতাম। দেখ, মেয়েটা বরফ না পেলে ম'রে যাবে। আমি তোমাকে পরে টাকা যোগাড় ক'রে দেব, নিশ্চয়ই দেব, কথা দিচ্ছি। আমার বাড়ি তো এখানেই, আমি তো আর পালিয়ে যাব না, বিশ্বাস কর।

না না, তা হয় না।—রূঢ়ভাবে বাবুলাল উত্তর দেয়। পচু বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, দয়া হ'ল না তোমার? হা ভগবান, এতটুকু বিশ্বাস তোমার হ'ল না, তোমার ঘরে কি ছেলে মেয়ে নেই ভাই? মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া পচু হায় হায় করিতে থাকে।

বাবুলালের মন কোমল হয়। তাহার মনে পড়িয়া যায় তিন বৎসর পূর্বে তাহার একটি সন্তান মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে ভুগিয়া মারা গিয়াছিল। মৃত শিশুটির কথা মনে পড়াতে আশ্বাস দিয়া বলে, আচ্ছা, থাম্ থাম্, দেখছি। টাকা হাতে হ'লে দিস, ফাঁকি দিস না যেন।

পচুর বুক আনন্দে ভরিয়া যায়, চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলে, না না, কক্ষণো না, দেখো তুমি। গাড়ি আসিয়া দাঁড়ায়।

ভেণ্ডর বলে, নেই, বরফ নেই। এই তো কৃষ্ণপুরে দিয়ে দিলাম যা ছিল সব। বিয়ে-বাড়ির জন্যে, খুব এসে ধরল।

দেখ না ভাই, একটু ভাল ক'রে। রুগীর জন্যে দরকার।—অনুরোধ করে বাবুলাল।

যা শালা, আমি কি মিছে কথা বলছি? তুই নিজেই দেখ্ না। বাবুলাল দেখিল, সত্যই বরফ নাই।

নাই? বরফ নাই? পচু যেন হঠাৎ কেমন হইয়া গেল। গাড়ি

ছাড়িয়া দিল। 'হায় ভগবান' বলিয়া পচু প্ল্যাটফরমের উপর পড়িয়া গেল।

পচুর বাড়িতে তখন যমে-মানুষে যুদ্ধ চলিতেছিল। ডাক্তারবাবু বলিলেন, খুব ভুল হয়ে গেছে নিবারণবাবু, বিকেলে আর একটা ইনজেকশন দিলে এতটা আর বাড়াবাড়ি হ'ত না, তারপর দেখুন বরফও নেই। রোগীকে ফেরানো বোধ হয় যাবে না।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু মুখ নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পচুর বাড়িতে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

রেণু ও বীণা আসিয়াছে। দাদু উঠিয়া বসিয়াছেন, শচীনের কোন নিষেধই তিনি শোনেন নাই। বলেন, আমি ভাল হয়ে গেছি। আর যদি মরি এখন, কোন দুঃখ নেই। হাত বাড়াইয়া বলেন, কাছে আয় তো দেখি, দেখি তোদের মুখ।

রেণু বীণার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে বৃদ্ধ তাকাইয়া থাকেন। চোখ দুইটি ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। হাঁ, অনেকটা শশধরের মত বটে। নিস্তারিণীর মুখের ছাপটা বীণার মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধের চোখ দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। দুই জনকে দুই পার্শ্বে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি হাসিয়া উঠেন। তারপর উন্মাদের ন্যায় বলিয়া চলেন, শচীন, ও শচীন, আমি এদের স্বীকার ক'রে নেব, কালের গতিকে স্বীকার ক'রে নেব আমি। বর্তমানকে স্বীকার ক'রে নেব। সেই কথাগুলি যেন প্রলাপের মত শুনাইতেছিল। শচীন দেখিল, বৃদ্ধের চোখ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে স্তিমিত ভাব আর নাই।

দাদু হাসিতেছেন। নূতন যুগের গতিশক্তি মনের ভিতর ফিরিয়া পাইয়াছেন বৃদ্ধ। নবজীবনের আলোক সম্প্রতি অস্পষ্ট। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর কোন গ্লানি নাই যেন। সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

রাখিয়া বৃদ্ধ তৃপ্তির হাসি হাসিয়া চলিয়াছেন, শিশুর মত সরল সে হাসি। বেণু ও বীণা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। দাদুর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহারা ভাবে, তাহাদের এই পিতামহ যাঁহার ভিতর প্রায় এক শতাব্দীকে ধরিয়া রাখা হইয়াছে তিনি যেন একখানি ইতিহাস। দ্বিধার ভাব কাটাইয়া উঠিয়া তাহারাও বৃদ্ধকে জড়াইয়া ধরিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে, তারপর ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করে।

গঙ্গাধর, ও গঙ্গাধর!—অবিনাশ ডাকেন। আনন্দের আতিশয্যে ডাকটা যেন একটু জোরেই বাহির হইয়া যায়।

আজ্ঞে?—গঙ্গাধর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়।

গঙ্গাধর, দেখ কতদিন পরে আজ আমি এদের পেয়েছি, বিক্ষুব্ধ মনটা শান্ত হয়েছে, বিক্ষিপ্ত ভাব আর নেই। মানুষ নিজেকে তার বংশধারার ভেতর দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, ভাবীকালের মানুষের ভেতর তার দেহের ও মনের সাদৃশ্য দেখে সে তৃপ্তি পায়। এই চাওয়া যখন উৎকট দাবীর মত হয়ে দেখা দেয়, তখনই বোধ হয় সে কষ্ট পায়, তাই না?

গঙ্গাধর কোন উত্তর দিতে পারে না। খাটের এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বৃদ্ধ থামিয়া শচীনের দিকে তাকাইয়া বলেন, তবে মনে রেখো তোমরা, আভিজাত্যের কোন সংজ্ঞা নেই। আভিজাত্য সংস্কার নয়, আভিজাত্য এক শ্রেণীর মানুষের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম। যাক ও-সব কথা, পচুর মেয়েটা কেমন আছে জান?

আজ্ঞে না।—উত্তর দেয় গঙ্গাধর। বৃদ্ধের কথাগুলি শচীনের মনঃপুত হয় নাই, সে তখন কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতেছিল।

দেখ কি কাণ্ড! কাল মিছামিছি কতকগুলো বকেছি ওকে। গরীবের দোষটা বেশি ক'রে ধরতে নেই। পেটে যার খিদে মাথা তার কি ক'রে ঠিক থাকবে বল? পচুর খাজনাটা মকুফ ক'রে দিও, কেমন?

যে আজ্ঞে।—বলিয়া গঙ্গাধর হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

তরুণ-মনের সংস্পর্শে বৃদ্ধের মনেও সজীবতা দেখা দেয় যেন। নীরদা ঠাকুরাণী হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসেন। মুক্তির আনন্দে আত্মহারা বৃদ্ধ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকেন—দেখ, ভাদুড়ীগিন্নী, দেখ। চন্দ্র সূর্য দুটোকে একসঙ্গে ধরেছি, দেখ। আসবে না আবার! আসতে দিই নি, তাই আসে নি। তৈার ছিলাম না কিনা। পদবীটা ম'রে গিয়ে আমি বেঁচে গেলাম ভাদুড়ীগিন্নী, এতদিনে বেঁচে গেলাম। বৃদ্ধ হাসিতে থাকেন।

তারপর ধীরে ধীরে প্রফুল্ল মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠে। মুখের গভীর রেখাগুলি স্পষ্ট হইয়া যায়। কি যেন ভাবিয়া বৃদ্ধ মনের ভিতর দুঃখ অনুভব করেন, ক্লান্তস্বরে প্রশ্ন করেন—কিন্তু তারা এল না কেন? শশধর আর বউমা ?

মানসিক এই পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিয়া বীণা তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়—মা বাবাও আসবেন, তুমি চিন্তা ক'রো না দাদু। তাঁরা আজ বিকেলের গাড়িতেই আসবেন, কোন চিন্তা নেই। নাও, অনেকক্ষণ ধরে ব'সে আছ, এখন একটু শুয়ে পড় দেখি।

বীণা বিছানাটা ঠিকঠাক করিয়া দেয়। বৃদ্ধ শুইয়া পড়িলে বেণু থায় বাতাস দিতে দিতে বলে—বীণা বাড়িতেই ছিল। টেলিগ্রামটা পৌঁছেছে প্রায় সাড়ে চারটের সময়। সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন। আমি ছিলাম কলেজে। বীণা প্রথমে আমাকে টেলিফোন ক'রে খবর দেয়। আমি বলি, বাবাকে খবর দাও।

বীণা বলে—দাদার কথামত বাবাকে টেলিফোন করি। মা এদিকে রওনা হবার জন্যে জিনিসপত্তর গোছাতে আরম্ভ করলেন। কাজ করছেন আর দুঃখ করছেন। মাঝে মাঝে দু-একটা ফোঁটা জলও চোখ বেয়ে পড়ছে।

নীরদা ঠাকুরাণী মুখের অদ্ভুত একটি ভাব করিয়া বলেন—দুঃখ ক'রে কি আর হবে বল! এতদিন আগলে রেখেছি ব'লে বেঁচে আছেন। আমার আর কি! এখন তোমাদের জিনিস তোমরা বুঝে-সুঝে নাও, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তাঁহার মুখটা প্রসন্ন হইল না দেখিয়া শচীনের মনে হয়, বৃদ্ধা যেন ভাবিতেছেন তাঁহার রাজত্ব অপরের অধিকারে চলিয়া যাইতেছে, কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। অবিনাশ থামিয়া বলেন—ওরা বুঝে নিয়েছে, এবার তুমি ক্ষান্ত দাও তো। তুমি বল দিদি। বীণা আবার বলিতে আরম্ভ করে—ডালহৌসী স্কোয়ারে বাবার অফিসের ফোন কনেকশনটা পেতেই লেগে গেল দশ মিনিট। তারপর যদিও বা পেলাম, অফিস থেকে বললে, তিনি বেরিয়ে গেছেন টালিগঞ্জ ফ্যাক্টরী দেখতে। এদিকে তো প্রায় পাঁচটা বাজে।

ফ্যাক্টরীতে টেলিফোন ক'রে বাবাকে সব বললাম। বাবা শুনে যেন মুষড়ে পড়লেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—তোমরা রওনা হয়ে যাও, আর দেরি ক'রো না। সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন হ'লে এখান থেকে গিয়ে তা আমি ধরতে পারব না। আমি—। শেষ হয় নি বাবার কথা এমন সময় সংযোগটা গেল কেটে। কে একজন বলছে—হ্যালো, কৌন্ হ্যায়, কৌন্ হ্যায়? কি ঝকমারি বল দেখি দাদু!

ঝকমারি! বীণার মুখের দিকে তাকাইয়া অবিনাশ বলেন—ঝকমারি না ঝকমারি। এ যে ঝকমারির যুগ চলেছে তোমাদের। বিবর্তন চলছে কিনা, তাই সৃষ্টির বয়স যতই বেড়ে যাচ্ছে মানুষের স্নায়ু-উপস্নায়ুরও বোধ হয় পরিবর্তন হচ্ছে ততই। তা না হ'লে এই সব উদ্ভট আবিষ্কার এই সব ঝকমারি মানুষ ডেকে সৃষ্টি করতে যাবে কেন বল? সুখ শান্তির পিছনে পিছনে ছুটছেন গতির হাত ধ'রে। গতির যে কি শক্তি তা তো জানত না মানুষ, তাই এবার শাস্তি পাচ্ছে। গতি এবার

মানুষকে হিড়হিড় ক'রে টেনে চলেছে। গতি না, শয়তান। সমর্থনের আশায় শচীনের দিকে তাকান বৃদ্ধ।

কি রকম? কি রকম?—প্রশ্ন করে বেণু। কথাটা যেন তাহার মনের মত হয় না।

এই যে মানুষের অগোচরে মানুষের মস্তিষ্কের পরিবর্তন হচ্ছে তা তোমাদের এই সব বিজ্ঞানীর দল ধরতে পারছে না, ধরতে পারবেও না। এক-একটা সভ্যতার বয়স বড় জোর চার কি পাঁচ হাজার বছর। ওই সামান্য সময়েরও আবার খানিকটা অংশ নিয়ে তারা মেতে থাকে, বুঝলে দাদু! তার আগের সময়টা তাদের কাছে অজানা। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর আগেকার মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে যদি বর্তমান মানুষের এই মস্তিষ্ক, তার স্নায়ু উপস্নায়ু মিলিয়ে দেখতে পারা যেত তবেই এই পরিবর্তন ধরা প'ড়ে যেত নিশ্চয়। মানুষ তা হ'লে অনেক দোষের হাত থেকে বেঁচে যেত, গালমন্দ দোষারোপও তাকে কেউ করতে পারত না। এমন একদিন এল যখন সমস্ত পৃথিবীর *জন্য* পাগল হয়ে গতির পূজা আরম্ভ ক'রে দিল সে। গতির পাপচক্রের ভিতর তার দেহ মন গাঁথা হয়ে ঘুরতে লাগল। সে কি আর ইচ্ছা ক'রে ঝকমারি করছে দাদু? যাবে কোথায়, ঝকমারি যে তাকে করতেই হবে।—কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন, তিনি থামিয়া যান।

এ কথাগুলি শচীনের বড় ভাল লাগে। সে সায় দিয়া বলে—হ্যাঁ দাদু, সত্যিই তাই। আমাদের দেহ ও মনে স্থূল গতির এ নেশা কোন দিন জাগে নি। কিন্তু ওরা আমাদের ভিতর এ নেশা ঢুকিয়ে দিলে। আমরা অন্য জাতের মানুষ, তাই ঠিক ভাবে এ গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে চলতে পারছি না, পদে পদে হাঁপিয়ে উঠছি। বেণু বাধা দিতে যায়। বৃদ্ধ হাত তুলিয়া নিষেধ করেন—থাক্ এখন, পরে আলোচনা করা যাবে। তারপর কি বলছিলে বীণা?

বীণা বলে—তারপর আবার এক্সচেঞ্জ, আবার কনেকশন। বাবা বললেন, আমার পক্ষে ট্রেন ধরা অসম্ভব। আমি আর তোমার মা পরের ট্রেনে যাচ্ছি। কি যে অসুখ, টেলিগ্রাম থেকে তো তা বোঝা যাচ্ছে না! আবার টেলিগ্রামটা পড় তো দেখি। প'ড়ে শোনালাম। জান দাদু, বাবার কথাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল আর এমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিলেন যে, তাও টেলিফোনে ধরতে পেরেছিলাম আমি।

বৃদ্ধ পুনরায় প্রফুল্ল হইয়া উঠেন। নীরদা ঠাকুরাণীর দিকে তাকাইয়া বলেন—ভাদুড়ীগিন্নী, ওদের ঘর-টর সব ঠিক আছে তো? ভোর হয়ে গেছে, ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর। ওরা আবার চা না কি সব খায়। গঙ্গাধর, ও গঙ্গাধর, শোন। চা—

বেণু বাধা দিয়া বলে—থামুন থামুন, আপনি থামুন মশায়। আমরা সব ঠিকঠাক ক'রে নিচ্ছি। এতদিন তো খোঁজ নেবার মত অবসর হয় নি, আজ আবার এত ব্যস্ততা!

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বেণু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে। দাদুকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলে—রাগ ক'রো না দাদু। বল, কষ্ট পাও নি তুমি? দাদু হাসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলেন—না, রাগ করব কেন? তুমি ঠিকই বলেছ ভাই, ঠিকই বলেছ তুমি।

তখন পূর্বদিকের আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সূর্য উঠিতেছে।

সূর্য উঠিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই একই সূর্য উঠিত। একই সূর্য প্রত্যহ উঠিয়াছে, আজও উঠিল। সূর্য দেখিল, মজুমদার-বাড়ি হইতে যে যুবক সেদিন বাহির হইয়া গিয়াছিল, সে প্রৌঢ়াবস্থায় নূতন নূতন মানুষকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সেই সকল মানুষ কল্পনার পথ দিয়া এই গৃহের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছে, এতদিন তাহাদের স্মৃতিই একমাত্র সম্বল ছিল। সেই একই সূর্য আরও দেখিল,

পচুর বাড়ি হইতে একজনকে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, যে আর কোনদিনই সে বাড়িতে ফিরিবে না, স্মৃতির রাজত্বে হয়তো বা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিবে—তারপর বুঝিবা সেই চিরন্তন সত্য, বিস্মৃতি যাহাকে বলে। সূর্যের সৌভাগ্য দেখিয়া মনে হিংসা হয় যেন।

লক্ষ্মী মারা গিয়াছে সংবাদ পাইয়া পিসিমা পচুর বাড়িতে গেলেন। মানদাকে প্রবোধ দিবার জন্য পাড়ার বাগদী-বউঝিদের অনেকেই ততক্ষণে আসিয়া গিয়াছিল। শব দাহ করিয়া নিবারণ ও পিসিমা পচু ও পচুর স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়ি লইয়া আসিলেন। নিবারণ বলিল, ওরা ও-বাড়িতে থাকলে পাগল হয় যাবে, শোক প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র থাকা ভাল।

আমিই মেরে ফেলেছি রে!—বলিয়া মাঝে মাঝে মানদা আর্তনাদ করিয়া উঠে, চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলে, মা, মা রে, আমি তোকে মেরে ফেলেছি মা। ভাত তুই আর আমার কাছে খেতে আসবি না মা, ও মা, মা রে!

অপর জগৎ হইতে এই কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইলে কেহ কি বিচলিত না হইয়া পারে?—ভাবে নিবারণ, প্রবোধ দিয়া বলে, ওসব ব'লে কি লাভ? ওসব ভোলবার চেষ্টা কর। ওগুলো হচ্ছে অজুহাত। মৃত্যু সব সময় অজুহাত খুঁজছে। মানুষকে তো যেতেই হবে, তাই একটা না একটা অজুহাত চাই। লক্ষ্মী যে চ'লে গেছে তার জন্যে দায়ী আমরা, যারা এত বুঝেও তার জন্যে কিছু করি নি। আমরা সকলের দিকে সমান মনোযোগ দিতে পারি নি ব'লে অনাদরে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে।

মানদা একটু চুপ করে, মনে হয় কথাগুলি ভাবে সে। নিবারণও ভাবিতে থাকে, মানুষকে এবং সমাজকে এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যেন সে নিজেকে নিজে অবহেলা না করে, তাহার নিকট হইতে এবং

সমাজের নিকট হইতে কেহই অবহেলা না পায়। নিজেকে এবং অপরকে সমান মর্যাদা দান করিলে দৃষ্টি ও ব্যবহারের ভিতর কোন বিভ্রম ও বৈষম্য থাকিবে না। সকলে মিলিয়া অভিযান চালাইলে ব্যাধি ও মৃত্যু অতি সহজে আর কোন অজুহাত খুঁজিয়া পাইবে না, তাহাদের প্রচেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইবে। প্রত্যেক মানুষ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নিজে আহরণ করিবে এবং সমাজ তাহাকে সাহায্য করিবে। যেগুলির অভাব সে নিজে মিটাইতে পারে নাই, সেগুলির প্রয়োজন সমাজ মিটাইবে।

মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করিয়া নিবারণ নির্জন ঘরে অশ্রুমোচন করে, বেণু বীণা আসিয়াছে জানিয়াও ঘরের বাহিরে যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

বেণু ও বীণা আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া গ্রামের সকলেই দেখিতে আসিতেছেন। অনেকে বলাবলি করিতেছেন—বাবা, কি কঠিন প্রাণ দেখ বুড়োর, কি ক'রে এদের ভুলে ছিল এতদিন? যেমন চমৎকার কথাবার্তা ব্যবহার, দেখতে শুনতেও তেমনই। অবিনাশকে বিদ্রূপ করিয়া কেহবা বলেন, 'সেই তো মল খসালি তবে কেন লোক হাসালি'?

বেণু বীণার আনন্দের সীমা নাই। যাহারাই দেখা করিতে আসিতেছে—প্রজা-পাঠক ধনী-দরিদ্র সকলেই আদর আপ্যায়ন পাইতেছে। তাহাদের নম্র এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। বেণু বীণা সেদিন কাহাকেও জলযোগে আপ্যায়িত না করিয়া ছাড়িয়া দেয় নাই।

সকলের শেষে ডাক্তারবাবু আসিলেন। তাঁহারও মনটা লক্ষ্মীর মৃত্যুতে ভাল ছিল না, কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে দেখিয়া অবিনাশ পরম উল্লাসের সহিত

বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। বৃদ্ধের যেন আনন্দ আর ধরে না, প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত ডাকিয়া বলেন, ডাক্তার, ও ডাক্তার, দেখ দেখ, ওষুধ পেয়ে গেছি আমি। তোমার ওষুধের আর আমার কোন দরকার নেই, দেখ। বেণু ও বীণাকে দেখাইয়া দেন তিনি। ডাক্তারবাবু না হাসিয়া থাকতে পারেন না। ঘরের ভিতর হাসির ফোয়ারা ছুটিয়া যায়। বৃদ্ধের আনন্দ দেখিয়া সকলেই আনন্দ করে।

তারপর হৃষ্টমনে দুই-একজন করিয়া সকলেই চলিয়া যায়, কেবল রবিবার বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয় থাকিয়া যান। মাস্টার মহাশয়ের সাহত ইস্কুল-সংক্রান্ত দুই-একটি কথা শেষ করিয়া অবিনাশ শচীনকে বলেন, শচীন, গতকালের খবরের কাগজটা একটু প'ড়ে শোনাও দেখি, কাগজটা পড়া হয় নি এখনও। শচীন পড়িতে আরম্ভ করে। তাহার পড়িবার ও বলিবার ভঙ্গী অত্যন্ত চমৎকার, সুন্দর উচ্চারণ। নয়াদিল্লীর খবরগুলি পড়িবার পর সে পড়ে—ঈস্ট বেঙ্গল সিচুয়েশন ডেটিরিওরেটস্। বৃদ্ধ চিন্তিতভাবে বলেন, আবার? হেডমাস্টার মহাশয় একটি পান হাতে লইয়া বলেন, তা আর হবে না কেন? জার্মানি থেকে ইহুদীদের মত ওরা হিন্দুকে তাড়াবেই তাড়াবে, আর সেজন্যই পাকিস্তান নিয়েছে ওরা। ওদের আর কি দোষ, হিন্দুরা যা সব অত্যাচার করেছে ওদের উপর! এবার শোধ নিচ্ছে ভাল ক'রে।

সব পাপ থেকে মাস্টার মশায়, সবই অধর্ম থেকে হচ্ছে। অনাচার আর অন্যায়ের ফল এসব।—উদাসভাবে কথাগুলি বলেন অবিনাশ।

ওরা তো আগে সবই হিন্দু ছিল, নীচুজাতের হিন্দু সব। গোঁড়া হিন্দুদের অত্যাচারে কি আর হিন্দু থাকতে পারল? সব মুসলমান হয়ে গেল। এবার প্রতিশোধ নিচ্ছে ভাল ক'রে।

শচীন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। হেডমাস্টার মহাশয়ের কথা

শেষ হইতে না হইতেই সে প্রতিবাদ করিয়া বলে, না, এ কথা ঠিক নয়, আপনার এ ধারণা ভুল।

মাস্টার মহাশয় হাসিবার ভান করিয়া বলেন, তাই নাকি? কিন্তু অপ্রিয় হ'লেও আমি জানি, শচীনবাবু, খাঁটি কথা হচ্ছে এই।

তর্ক করা শচীনের স্বভাব, তর্কের বিষয় পাইলে আর রক্ষা নাই। সে মাস্টার মহাশয়ের এই শ্লেষে উত্তেজিত হইয়া বলে, খাঁটি তো নয়ই, বরং এসব ধারণা উদ্ভট, যুক্তির নামগন্ধ কিছু নেই এতে।

মনক্ষুণ্ণ হইলেও মুখে যথাসম্ভব প্রসন্ন ভাব বজায় রাখিয়া মাস্টার মহাশয় বলেন, কি রকম

হিন্দুরা মুসলমানের ওপর অত্যাচার করেছে—এ কথা যাঁরা বলেন, আমার মনে হয় তাঁরা বাংলা দেশের সমাজ সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ। বলতে পারা যায়, হিন্দুদের মধ্যে ধনী মহাজনের সংখ্যা বেশি হওয়াতে যারা যারা উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। জমিদার মহাজন—জমিদার মহাজন। পৃথিবীর সব জায়গাতে তাদের ওই একই পরিচয়। তাদের আবার হিন্দু-মুসলমান আছে নাকি?

একটু ব্যঙ্গের ভাব লইয়া মাস্টার মহাশয় উত্তর দেন—ও ওই একই কথা, একটু ঘুরিয়ে বললেন আপনি। সোজাসুজি স্বীকার করতে ভয় পান বোধ হয়।

শচীনও দমিবার পাত্র নয়। অবিনাশ কৌতুক অনুভব করেন। শচীনের উত্তর শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। শচীন বলে, পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান জমিদার আর মহাজনেরা প্রজা-খাতককে চিনে চিনে তাদের সঙ্গে হিন্দু মুসলমান হিসাবে ব্যবহার করেছে—আপনার এই কথার আমি প্রতিবাদ করছি। জমিদার মহাজনদের ব্যবহারের রীতি কি এই? তা হ'লে ভারতের

হিন্দুপ্রধান অন্যান্য জায়গাতে এত গরীব হিন্দু কেন রয়েছে মাস্টার মশায়? কই, এর আগে কোনদিন তো এ কথা শোনা যায় নি যে, পশ্চিম-বঙ্গের ধনী মুসলমান জমিদার মুসলমান প্রজাদের খাজনা মকুফ ক'রে দিয়েছে আর হিন্দু প্রজার ওপর অত্যাচার করেছে বেশি ক'রে

কথাটা না মানিয়া লইয়া মাস্টার মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলেন—সবই তো বুঝলাম, তবে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশি হ'ল কি ক'রে আর এত ধনী হিন্দুই বা সেখানে এল কোথা থেকে—সে কথা তো বুঝতে পারলাম না?

শচীনের ভিতর তখন তর্কের ঝোঁক আসিয়া পড়িয়াছে। সে বলিয়া চলে—পাপ অধর্মের কথা না তুলে, ঘৃণা থেকে যে কিছু না কিছু হয়েছে, সে কথা স্বীকার করব। সে ঘৃণার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা এখন আর করব না, তবে এ ঘৃণার ভাব যে ভারতের সব জায়গাতে হিন্দু মুসলমানের মনের ভিতর বর্তমান রয়েছে কম-বেশি হিসেবে, সে কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উঁচুশ্রেণীর হিন্দুরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে ভারতের সব জায়গাতে ঘৃণা আর অত্যাচার করেছে, সামান্য হ'লেও আজও যে করছে সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। দক্ষিণ-ভারতে ঘৃণার এই আবহাওয়া বোধ করি পূর্ববঙ্গের তুলনায় শতগুণে প্রকট হয়ে আছে। তবুও দিল্লীর বাদশারা তাদের কর্মকেন্দ্র থেকে বহুদূরে পূর্ববঙ্গে কেন বা ধর্মপ্রচারে সফল হ'ল আর কাছাকাছি সব জায়গাগুলোতে তা পেরে উঠল না, তাও তো চিন্তা ক'রে দেখা উচিত।

কেন?—প্রশ্ন করেন হেডমাস্টার, শুনি আপনার যুক্তি।

দেখুন মাস্টার মশায়, যে বিষয়টা নিয়ে আজ এত কথা হচ্ছে, আমার মনে হয় সেটা কোন আলোচনার বিষয়বস্তুই নয়। তবুও আপনি যখন বলছেন, আমি দু-একটা কথা না ব'লে পারছি না। আমি

ঐতিহাসিকও নই, নৃতাত্ত্বিক প্রত্নতাত্ত্বিকও নই, তবে আমার ধারণা যা তাই বলছি শুনুন। ধর্মান্তরিত বলতে যা বোঝা যায়, পূর্ববঙ্গের এই মুসলমান সমাজে সে রকম খুব কম লোকই আছে। আসলে এরা পুরোপুরি হিন্দু ছিল না কোনদিনই। উত্তর-ভারতের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, সেখানে ছলে বলে আর অত্যাচারে ধর্মান্তরিতের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। পূর্ববঙ্গেও এই অভিযান চলেছিল বটে, তবে তখনও হিন্দু-সভ্যতা সেখানে প্রতিষ্ঠা পায় নি, সেজন্য মানুষের নৈতিক প্রতিরোধের শক্তিও ততটা ছিল না। যেটুকু ছিল, প্রলোভনে আর অত্যাচারে তাও ভেঙে পড়েছিল।

বুঝতে ঠিক পারছি না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তবে কি ছিলেন? একটু নতুন নতুন লাগছে যে আপনার কথাগুলো শচীনবাবু।—বিস্মিত ভাবে বলেন হেডমাস্টার মহাশয়।

নতুন ঠিক নয়, পুরনো কথাই নতুন ক'রে বলছি। আর্যরা আসবার পর দ্রাবিড়রা আদিবাসীরা যে তাদের বিশিষ্ট সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে সহজে তাদের স্বীকার ক'রে নিয়েছিল তা নয়। বিরোধ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও উদারতার ভিতর দিয়ে আর্যদের এই বিজয় অভিযান বহুদিন পর্যন্ত চলে। অনেক জায়গাতে দ্রাবিড়রা এই সব সংঘর্ষ আর অশান্তি থেকে বাঁচবার জন্যে নিরাপদ জায়গাতে স'রে গিয়ে বসবাস করেছে। বনজঙ্গল-নদীনালা-পূর্ণ পূর্ববঙ্গ ও পর্বতসঙ্কুল অনুর্বর দাক্ষিণাত্যে তারা স'রে যেতে বাধ্য হয়। গঙ্গা-সিন্ধুর অববাহিকায় প্রচুর উর্বর জায়গা পেয়ে আর্যরা আর এদিকে পা বাড়ায় নি। সুতরাং এই সব দ্রাবিড়রা অথবা দ্রাবিড়েতর লোকেরা আর্যদের প্রভাব থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। খানিকটা স্বাতন্ত্র্য, ঘৃণা বা প্রতিশোধের ভাব—যাই বলুন, এদের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তারপর যখন অনুষ্ঠানসর্বস্ব হিন্দু সমাজের বুকে বৌদ্ধধর্মের শাশ্বত বাণীর

প্লাবন এল, তখন বোধ করি এদের অবস্থা না-দ্রাবিড়, না-আর্য, না-বৌদ্ধ ভাব—মেশামেশি যা হ'ল একটা কিছু রকমের। গঙ্গার মোহনায় পূর্ববঙ্গের জায়গাগুলি তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এক রকম। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও প্রভাব এড়াতে পারে নি। বিকৃত বৌদ্ধবাদের ভোগবিলাস ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনাদর্শ এ সমাজেও এসে ঢুকেছিল। কিন্তু হিন্দুত্বের পুনরভ্যুদয় যখন হ'ল তখনও এদের মানুষ ব'লে কেউ গ্রাহ্যও করল না; ধর্মের নানারকম কড়াকড়ি দেখে এরাও বোধ হয় এগিয়ে গেল না।

একটু থামিয়া শচীন বলে—মুসলমান যখন এসেছিল তখন তাদের সুবিধে হয়েছিল খুব। ক্ষেত্রটা তৈরী হয়ে ছিল খানিকটা। তার ওপর ধর্মমতে ও ধর্মপালনে ছিল সাদাসিধে ভাব, সৌভ্রাত্রের বুলি ও কাফের-বিরোধী ধ্বজা। যারা প্রতিরোধ করেছিল, তাদের জন্যে সামান্য অত্যাচার ও প্রলোভন। পূর্ববঙ্গে মসজিদের পর মসজিদ গ'ড়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে? সেখানেও তো দ্রাবিড়দের বসতি হ'ল, তারা কেন সব মুসলমান হয়ে গেল না?—প্রশ্ন করেন মাস্টার মহাশয়। শচীনের কথাগুলি বিশ্বাস করিতে পারেন না যেন। শচীন উত্তর দেয়, কি ক'রে হবে বলুন? দ্রাবিড়রা স'রে আসবার পর আর্যরা বহু শতাব্দী ধ'রে উত্তর-ভারত নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণ-ভারতের দিকে তাদের প্রসার ও অভিযান চলে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুই জাতির ভিতরকার বিরোধের ভাবটা ক'মে যায়। উচ্চতর জীবনাদর্শের কাছে দ্রাবিড়রা নতি স্বীকার করে। এমন সময় মুসলমানেরা আসে এ দেশে। গায়ের জোরে নিরীহ এবং নিরাসক্ত হিন্দুদের হটিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করল বটে, কিন্তু বিবাদ ও সংঘর্ষ লেগেই থাকল। উত্তর-ভারতে ধর্ম-প্রতিষ্ঠা তাদের আর হ'ল

না। দক্ষিণ-ভারতের দিকে নজর দিতেও তাদের একটু সময় লেগেছিল, আর পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল বীর রাজপুত আর দুর্ধর্ষ মারাঠীরা। মুসলমান সাম্রাজ্য আর ধর্ম কোনটাই সেখানে প্রতিষ্ঠা পেল না।

বেণু বাধা দিয়া বলে—তা হ'লে কি আপনি বলতে চান, হিন্দুর গোঁড়ামী, হিন্দুর আচারগত ধর্ম, সঙ্কীর্ণতা চিন্তাশীল মানুষকে হিন্দুধর্ম থেকে বিমুখ ক'রে দেয় নি? ভিতরে ঘৃণা ভয় প্রলোভন ও প্রতিশোধের ভাব আর বাইরে অত্যাচারের ফল—সব কিছু মিলিয়ে না-বৌদ্ধ না-হিন্দু এই সব দ্রাবিড়রা আর দ্রাবিড়েতর লোকেরা হিন্দুবিরোধী অভিযাত্রীদের সঙ্গে রাতারাতি হাত মিলিয়ে দেয়? আদর্শ ব'লে কিছুই ছিল না তাদের?

না, তা কেন? তাও ছিল। এক অংশের মধ্যে গৌণ কারণ হিসেবে তাও হয়তো ছিল। হিন্দু ভগবানকে ভুলে তাঁর সৃষ্টিকে ভগবান মনে ক'রে পূজো করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে আর্যদের মত সৃষ্টির ভিতর ভগবান না দেখে শুধু পুতুলের আর গাছের পূজো চলতে লাগল। ধর্মের গতিশীলতা, প্রাণশীলতা নষ্ট হয়ে গেল। ধর্মের নামে আচার বিচার ছোঁয়াছুঁয়ি ও অনুষ্ঠানকে ধর্ম ব'লে চালিয়ে দিল লোভী হিন্দু পুরোহিতের দল, যাদের পূর্বপুরুষেরা নির্লোভ আচার্য ব'লে প্রতিষ্ঠা আর সম্মান পেয়েছিলেন। স্বার্থ ও সুবিধাকে বড় ক'রে অনুষ্ঠানের ভিতর ব্রাহ্মণরা স্বর্গের চাবিকাঠি নিয়ে ব'সে থাকলেন। ধর্মের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। ভগবানের উপলব্ধির পথে, মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে এসে পড়ল দুস্তর বাধা ও বিপত্তি। অর্থ না বুঝে কতকগুলি প্রাণহীন মন্ত্র উচ্চারণ চলল ঘরে ঘরে। পরের যুগে এই আচার-বিচারই ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করেছে, শুধু তাদের নয়—ধর্মের ঐতিহ্যের মূলে পর্যন্ত কুঠারাঘাত করেছে।

হাসিয়া বলে—দেখতেই তো পাচ্ছেন মাস্টার মশায়, মানুষেরই সৃষ্ট ধন আজ ধনবৈষম্যরূপে মানুষের সমাজকে গ্রাস করতে বসেছে।

বেণু বলিয়া উঠে—ঠিক তাই, ঠিকই বলেছেন আপনি শচীনবাবু।

অবিনাশের কথাগুলি ভাল লাগে না। মনে মনে ভাবেন, উহারা সকলেই ব্রাহ্মদের মত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যেন।

হেডমাস্টার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান, মুখ কালো করিয়া বলেন—তা যাক, কিন্তু এ কথা তো ঠিক যে হিন্দুর অনুপাতে মুসলমানরা গরীব আর তার জন্যে হিন্দুরাই দায়ী খানিকটা?

কি ক'রে? মুসলমান বাদশাদের বড় বড় কর্মচারী, সুবাদার, নবাবরা হিন্দু ছিল, না, মুসলমান ছিল? কোথায় গেল তারা? তারা নষ্ট হয়ে গেছে। তার জন্য দায়ী তাদের বিলাস, ব্যসন ও অপচয়—এক কথায় জীবনভঙ্গী। হিন্দুর টাকা আদায় ক'রে সেই টাকা যখন তারা উড়িয়েছে, হিন্দুরা নানা রকম অসুবিধার ভিতর দিয়েও তা বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংগ্রহ করেছে—সমাজব্যবস্থা ও জীবনাদর্শই তার জন্য দায়ী, হিন্দুরা নয়। হিন্দুরা কারও কাছ থেকে কেড়ে নেয় নি। মুসলমানদের পক্ষে এ ভাবে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ভাল হয় নি নিশ্চয়, কিন্তু হিন্দুরা এর জন্যে একটুও দায়ী নয়। আজও সাধারণ মুসলমান দিনে তিন টাকা রোজগার করলে তিন টাকাই খরচ ক'রে ফেলে, ঠিক কিনা খোঁজ ক'রে দেখবেন।

ছাতা হাতে করিয়া নমস্কার করিতে করিতে মাস্টার বলেন—আচ্ছা আচ্ছা, পরে আলোচনা হবে, পরে আরও আলোচনা হবে, আজ থাক্। কৃত্রিম হাসি হাসিতে হাসিতে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া যান। শচীনও বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পিছনে পিছনে বাহির হইয়া যায়।

একটু পরে বীণা জিজ্ঞাসা করে—ইনি কে দাদু? অবিনাশের

বলিবার পূর্বেই বেণু বলিয়া দেয়, ইনি হচ্ছেন শচীনবাবু, ইস্কুলের মাস্টার নিবারণ চক্রবর্তীর ভাই। দিদিমার নিকট হইতে সে ইতিমধ্যেই মাস্টারদের সম্বন্ধে বহু কথা জানিয়া লইয়াছে।

অবিনাশ বলেন—ছেলেটি লেখাপড়ায় খুব ভাল, কিন্তু একটু বেশি কথা বলে, তাই না? কেহই সে কথার উত্তর দেয় না।

অপরাহ্ণের দিকে বউদি বেড়াইতে আসেন। দিদিমা পরিচয় করাইয়া দেন—এ বেণু, ভাল নাম উৎপল, এম. এ. পড়ে। আর এ হচ্ছে বীণা, আই. এ. পরীক্ষা দেবে এবার। ও নাকি ওর দাদুর মত খুব ভাল সেতার বাজাতে শিখেছে, অনেক মেডেলও পেয়েছে নাকি! বেণুও বেশ গান করতে পারে শুনেছি।

উভয়েই বউদিকে নমস্কার করে। বউদির দিকে তাকাইয়া নীরদা বলেন—হাসপাতালের ডাক্তার শরৎবাবুকে কাল দেখেছ তো? ইনি হচ্ছেন তাঁরই স্ত্রী, গৌরী।

স্মিতহাস্যে বউদি বলেন—বেশ বেশ, কোন্ কলেজে পড়েন বীণা দেবী?

আশুতোষে পড়ি।

বেশ, বাবা মা আসেন নি?

না, তাঁদের আজ বিকেলের গাড়িতে আসবার কথা আছে।

বেণু কথাটি সম্পূর্ণ করিয়া বলে—বাবা বাড়ি ছিলেন না কিনা, তাই।

বউদিকে তাহারা উপরতলায় তাহাদের ঘরে লইয়া যায়। দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া বউদি দেখেন, অবিনাশ অঘোরে ঘুমাইতেছেন। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলেন—কদিন আছেন তো?

ঠিক কিছু নেই, বাবা এলে ঠিক হবে।—বীণা উত্তর দেয়।

কাল যা ক'রে কেটেছে, শুনেছেন বোধ হয়? বয়স তো হয়েছে,

কেবল মনের জোরে বাঁচা এখন। আপনাদেরই এসে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

আমরা তো চেয়েছিলাম, কিন্তু কি করি বলুন? উনি অনুমতি দেন না। আর বাবাও বলেন, জোর করলে কোন লাভ না হয়ে ক্ষতিই বেশি হতে পারে, তোমরা যেয়ো না। কথাটা লইয়া বেশি আলোচনা করা ভাল না মনে করিয়া গৌরী বলেন—যাক ওসব কথা। দেশে যখন এলেন তখন দু-একদিন থেকে ঘুরে ফিরে দেখে যান দেশের অবস্থাটা। মেলা-মেশা করবার মত লোক তো পাওয়া যায় না। গান বাজনা হৈ-হল্লা ক'রে দুটো একটা দিন কাটানো যাবে, কি বলেন?

তা তো কিছুদিন কাটানো যেত, কিন্তু কলেজ খোলা রয়েছে কিনা তাই অসুবিধা।

ও, তা বটে। তবুও যে কদিন থাকেন!

বীণা ও বেণুর কথাবার্তার ভিতর দিয়া বউদির সহিত আলাপ জমিয়া উঠিতে বেশি দেরী হয় না। উঠিবার সময় বউদি বলেন—আজ তা হ'লে উঠি ভাই। কা'ল সন্ধ্যায় আপনাদের আমার বাসাতে একবার আসা চাই কিন্তু। চা আমার ওখানেই খাবেন। কেমন, যাবেন তো? কথা দিচ্ছেন?

মৃদু হাসিয়া বেণু বলে—আচ্ছা, তাই হবে। বউদি দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া হঠাৎ পিছন ফিরিয়া বলেন—এক মুহূর্তের পরিচয়, কি ক'রেই বা অনুরোধটা করি, কিন্তু না ক'রেও পারছি না।

থামিয়া বীণার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলেন—কাল আসবার সময় দাদুর সেতারটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন বীণা দেবী, অনুরোধ রইল। বাজনাটা একটু শুনিয়ে দেবেন। এ বাড়িতে তো আর আপাতত শোনবার সুবিধে হবে না, সকলে এসে যাবেন। বীণার বীণা-বাদন না শুনলেই নয়।

বীণাও হাসিয়া উত্তর দেয়—আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে বউদি।

নিবারণের বাসার কাছাকাছি হইতেই বউদির প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠে। পচুর স্ত্রী কাঁদিতেছে তখনও।

আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে পিসিমা কাছে আসিয়া বলেন—বল তো বউমা, কি ক'রে বোঝাই এদের? আহা, না খেয়ে ম'রে গেলেও তো সে আর ফিরবে না। এখন ধৈর্য ধরতে হবে, জোর ক'রে ভোলবার চেষ্টা করতে হবে। পারা কি যায়? বুঝি, পারা যায় না। তবুও সংসার তো ঠিকই চলেছে, কোমর বেঁধে আবার সংসারও তো করছে লোকে, কি বল? সংসারে শোক তাপ না পেয়েছে এমন ভাগ্যবান কজন আছে বল? পিসিমার মুখখানি বড় করুণ দেখায়। একটু থামিয়া খাটো গলায় বলেন—তিনিও খান নি, ভাইপোও খায় নি, কেউ না।

বউদি ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন।

পাশাপাশি সংলগ্ন দুইটি মাটির কোঠাঘর। একটিতে নিবারণ, অপরটিতে পিসিমা ও শচীন থাকে। নিবারণ চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে কয়েকখানি ছবি টাঙানো রহিয়াছে—ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট, বিবেকানন্দ ও ম্যাডোনার একখানি ছবি। নদীপারের সূর্যাস্তের একটি দৃশ্য—খেয়া-নৌকা দেখা যাইতেছে নদীতে। কাঠের তাকের উপর রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও গৌতম বুদ্ধের মার্বেল-পাথরনির্মিত একই প্রকারের মূর্তিগুলি সাজানো রহিয়াছে, প্রত্যেকের গলায় গোলাপফুলের মালা। ধবলশুভ্র পবিত্রতার পরিবেশটি, দেখিতে বড় ভাল লাগে। দেওয়ালের উপর খড়িমাটি দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—'বাপুজী, তোমার অধম সন্তান্‌দিগকে ক্ষমা করিও।'

ঘরের অপর অংশে সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। বিছানার এক পাশে কতকগুলি বই, খবরের কাগজ ইতস্তত

বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে। বিছানার চাদরটা খাট হইতে একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বালিসে ওয়াড়ের বালাই নাই। তোয়ালেটা মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। কাপড়চোপড় কোনটা বাক্সের উপর, কোনটা বা টেবিলের উপর, দুই-একটি জামা হয়তো বা মশারির উপরেই রহিয়া গিয়াছে।

এই দেখ ঘর, বউমা। একটু ঠিক ক'রে দিয়েছি কি পরমুহূর্তে এসে দেখবে সব একাকার। ক'রে ক'রে ব'লে ব'লে আর পারি না। তাই আর কিছু করি না এখন, বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

গৌরী হাসেন। নিবারণ উঠিয়া বসে। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সে।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়া বউদি স্নেহের সহিত ডাকেন—নিবারণবাবু! ও নিবারণবাবু! দেখুন, তাকান আমার দিকে।

নিবারণ তাকায় না। গভীর মমতার সহিত বউদি বলিয়া চলেন—উঠুন, আপনাকে শান্ত হতে হবে। আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা, আপনি আমাদের পথ দেখাবেন। আপনার কি এত বিচলিত হওয়া সাজে নিবারণবাবু? ভেবে দেখুন, এই মুহূর্তে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পরিবারে এমনতর হাহাকার উঠছে, শুধু এক পচুর পরিবারেই নয়। জীবনের এই অপচয় সর্বত্র, এ বিধান ভগবানের ইচ্ছা। আপনি উঠুন, চেষ্টা করুন এই অপচয় নিবারণ করতে। কটা জীবন সার্থক হয়েছে নিবারণবাবু? সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত কজনে পরিপূর্ণতার তৃপ্তির আস্বাদ পেয়েছে, বলুন? বহুদিন তো অনেকে বাঁচে, পরিণত বয়স পর্যন্ত। কিন্তু জীবনের সম্পদ কি তারা পেয়েছে? সংগ্রহ করতে পেরেছে কিছু? কিছুই না। নিবারণ মাথা তুলিয়া কি যেন বলিতে গিয়া পুনরায় মাথা নীচু করিয়া ফেলে। বউদি তখন উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া চলিয়াছেন—ছিঃ, এ দুর্বলতা আপনার শোভা পায় না। মানুষের দিকে

তাকিয়ে দেখুন, সে কি ভুলে যাচ্ছে না? আজকের এই ক্ষতিকে কি সে ভগবানের ইচ্ছা ব'লে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে না? তবুও দেখুন, তাতেও তার শিক্ষা হচ্ছে না কিন্তু। জীবনটাকে বড় ক'রে দেখে আবার ভুল করছে সে। নিজে কাঁদছে, দুঃখ দিয়ে অন্যায় ক'রে অপরকে কাঁদাচ্ছে। আসুন, উঠে আসুন। খাবেন চলুন। আপনার বেঁচে থাকা যে প্রয়োজন। সময়—তাদের শোক ভুলিয়ে দেবে সময়। উঠুন, মনে করুন আপনি চলেছেন তাঁরই সেবা করবার জন্যে বেঁচে থাকতে, যাঁকে আপনি সমস্ত সৃষ্টির ভিতর অনুভব করেন। মনে নেই, সেই যে বলেছিলেন বিজয়া-সম্মিলনীতে?—দেহকে নষ্ট ক'রে তো বেঁচে থাকা যায় না। আপনি যে আপনি সে তো দেহকে নিয়েই, না, তা বাদ দিয়ে? দেহতে শক্তিও থাকা চাই তাঁরই কাজ করবার জন্যে। ইচ্ছে ক'রে এ দেহকে নষ্ট ক'রে আপনি যদি অসময়ে চ'লে যান, তবে বলুন কে থাকবে আমাদের জন্যে?

কথাগুলিতে নিবারণের মনে শান্তি ফিরিয়া আসে, বাঁচিবার পক্ষে যুক্তি দেখিতে পায় সে। আশ্চর্য হইয়া ভাবে, কত জ্ঞান বউদির! কেমন শিক্ষিত মন, কথাবার্তাগুলি কত না সুন্দর, প্রীতিপ্রদ আর যুক্তিতে ভরা!

সত্যই সময় তাহাদের দুঃখ অপহরণ করিবে। হাঁ, সময়ই বটে। পৃথিবী ঘুরিতেছে। ঘূর্ণায়মান এই পৃথিবীর বুক হইতে সময়ের জন্ম হইতেছে। সময়, জীবন, ঘটনা ও ইতিহাস হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবী গতিহীন হইলে জীবন বলিয়া কিছু থাকিবে না। ঘটনাও ঘটিবে না আর। তবে কি মানুষ তাহার মনের এই অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী রূপ পৃথিবীর স্বভাব হইতেই পাইয়াছে? এই যে দেহ-মনের বিচিত্র খেলা, ইহা বোধ করি পৃথিবীর অন্তর হইতে পাইয়াছে সে। বাঁধন ছিঁড়িয়া পৃথিবী যেন কোথায় চলিয়া যাইতে চায়, কিন্তু সে তো পারে না। কে যেন তাহাকে অহরহ ডাকিয়া চলিয়াছে—আয়, আয়,

আয়। আর কে যেন বলিতেছে—আমি তোমাকে যাইতে দিব না। এই দুই অনন্ত ইচ্ছার, এই দুই অনন্ত অফুরন্ত শক্তির স্বাভাবিক ফলস্বরূপ পৃথিবীর অন্তরে চেতনারূপে এক মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, জীবন পাইয়াছে সে। সে জীবন পাইয়া একটানা ঘুরিয়া চলিয়াছে।

চলমান পৃথিবী, এই একই সচল জীবন তাহার সন্তান মানুষকে সে দান করিয়াছে। সেও যেন তাহার কক্ষে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, শান্তির জন্য বাঁধন কাটিতে চাহিতেছে, মানুষও তাহাই চাহিতেছে। এ কি লীলা!

শচীনকে সঙ্গে করিয়া নিবারণ খাইতে বসে। বউদি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, মুখখানি তৃপ্তির আনন্দে ভরিয়া উঠে। শচীনের ঘরে একখানি চেয়ারে বসিয়া বউদি তাহাদের খাওয়া দেখেন আর ভাবেন, এই ভদ্রলোকের মনটা কেমন সুন্দর; কিন্তু ইহার চালচলন কেন এমন অদ্ভুত? ইনি কি কখনও সংসারী হইবেন না? এমন লোক তো সচরাচর দেখা যায় না।

খাওয়া শেষ হইলে বউদি বলেন—আজ আসি, নিবারণবাবু। কাল সন্ধ্যায় শচীনবাবুকে সঙ্গে ক'রে আমার বাসায় যাবেন একবার। যাবেন তো?

ঈষৎ হাসিয়া লজ্জিতভাবে নিবারণ উত্তর দেয়—যাব। নিবারণ তাকাইয়া দেখে, বউদি চলিয়া যাইতেছেন। কেমন যেন মায়া হয় মনে। কিছুদূর গিয়া বউদি একবার ফিরিয়া তাকান, নিবারণের চোখে চোখ পাড়য়া যায়। সঙ্কুচিত হইয়া নিবারণ চোখ ফিরাইয়া লয়।

বিকালের গাড়ীতে শশধর ও স্নেহলতা আসিলেন। বেণু স্টেশনে গিয়াছিল। কামরা হইতে নামিতে নামিতে স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করেন—

কেমন আছেন রে দাদু ? বেণু উত্তর দেয়—ভাল আছেন, চিন্তার কোন কারণ নেই।

যাক্, বাঁচা গেল। কিন্তু অসুখটা কি রে ?

ডাক্তারবাবু বলেছেন, ব্লাড প্রেসার।

ব্লাড প্রেসার ?—সকলেই চিন্তাযুক্তভাবে চলিতে আরম্ভ করে।

স্নেহলতার এই প্রথম শ্বশুরালয়ে আগমন, শ্বশুরকে এই প্রথম দেখিবেন। শ্বশুরালয় সম্বন্ধে যৌবনে তাঁহার কত কল্পনাই না ছিল। আজ তিনি প্রৌঢ়া। তবুও তাঁহার যেন লজ্জা করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, কেন তিনি এতদিন এ বাড়িতে আসেন নাই ? বিবাহ সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কত কথাই হয়তো বৃদ্ধের কানে গিয়াছে মনে করিয়া সঙ্কোচও খুব হইতে লাগিল। শঙ্কিত পদে তাঁহারা গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গৃহের সম্মুখে আসিয়া স্নেহলতা একবার থামিয়া যান, চতুর্দিক লক্ষ্য করিয়া দেখেন, কতকালের কত না কাহিনী লইয়া অট্টালিকাটি দাঁড়াইয়া আছে! কল্পনার সহিত বাস্তবকে মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

তারপর ধীরে—অতি ধীরে তাঁহারা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অতীত যেন তাঁহাদের সহিত তখন কথা বলিয়া চলিয়াছে, কথাগুলি তাঁহারা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন যেন।

অত্যন্ত শান্তভাবে বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। প্রণাম করিবার পর বৃদ্ধ মুখখানি প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে কাছে লইয়া বসেন। নিস্তারিণীর ছবিকে তাঁহারা উদ্দেশে প্রণাম করেন।

অনেকক্ষণ কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। গভীর ও প্রশান্ত নীরবতা কক্ষটিতে বিরাজ করিতে থাকে।

হঠাৎ অবিনাশ ডাকিয়া ওঠেন—গঙ্গাধর! গঙ্গাধর!

গঙ্গাধর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়।

চিঠি দুখানা বের করত।—গঙ্গাধর টেবিলের দেরাজ হইতে চিঠি দুইখানি বাহির করিয়া বৃদ্ধের হাতে দেয়। সেগুলি শশধরকে দিয়া অবিনাশ বলেন, ছিঁড়ে ফেল এগুলো, ছিঁড়ে ফেল তুমি। শশধর দেখিলেন, তাঁহারই সেই চিঠি দুইখানি—ত্রিশ বৎসর পূর্বের লেখা। প্রৌঢ় পুত্র বৃদ্ধ পিতার সম্মুখে লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। চিঠিগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া তিনি বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

সেই রাত্রিতে কিছুক্ষণ পরে ঝাউগাছের ভিতর দিয়া চাঁদ উঠিতেছিল। বীণার পিঠের উপর হাত রাখিয়া অবিনাশ যেন তাহা শিল্পীর দৃষ্টি লইয়া দেখিতেছিলেন। ঝাউয়ের শব্দকে দীর্ঘনিশ্বাস বলিয়া তাঁহার আর ভুল হয় নাই।

গঙ্গাধর দত্ত নিবারণের বাসায় গিয়া সংবাদ দিল, স্নেহলতাকে সঙ্গে করিয়া শশধর কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। নিবারণ শুনিয়া বলিল, বেশ, যাব। পচুকে নিয়ে ব্যস্ত আছি আজ, কাল সকালে গিয়ে দেখা ক'রে আসব। দাদু ভাল আছেন তো? আছেন? বেশ ভাল।

গঙ্গাধর চলিয়া গেলে শচীনের দিকে তাকাইয়া নিবারণ বলে, এই যে বর্জন করবার নীতি, এটি হচ্ছে ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্য। আদর্শের সংঘাত হ'ল, অমনই বর্জন করো। আধ্যাত্মিক প্রেরণা এল, সকলকে বর্জন করো। জীবনের দিকে সামনাসামনি কেউ বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। একরকম পরাজয়ই একে বলা যেতে পারে। ত্যাগ করছেন যতই, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছেন ততই, কাজের প্রতি বিমুখতা এসে যাচ্ছে। সে কথা জিজ্ঞাসা করলে সকলেই বলেন, আত্মিক শক্তি লাভ করতে হবে আগে, তারপর কর্ম। আত্মিক শক্তি লাভ করতে করতে জন্মই কেটে গেল, কর্ম করা আর হয়ে উঠল না। পাশ্চাত্য জগতের ছবিটা আবার এর অনেকটা উল্টো। কর্ম ছাড়া তাঁরা খুব কমই বোঝেন, কর্মের পূজো নিয়ে ব্যস্ত। সেজন্য জাগতিক ও ব্যবহারিক

দিক থেকে মনে হচ্ছে, তাঁরাই যেন জিতে যাচ্ছেন। মুখে প্রচুর বড় বড় ফাঁকা কথাও আছে, আসলে কেউ জিতছে না কিন্তু। শরীরও সুস্থ থাকা চাই, শক্তিও থাকা চাই তাতে, কর্মও কিছু না কিছু করা চাই-ই। মনও সুস্থ থাকা চাই, শক্তিও থাকা চাই, তাতে আবার আত্মিক জগতের খবরাখবরও জানতে হবে। তবেই তো মানুষ মানুষ, তবেই না সভ্যতার অগ্রগতি। এই কর্মযোগের প্রেরণা ভারতকে কে দিয়েছেন জান? ইনি।—স্বামীজীর মূর্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেখায় নিবারণ।

পচুর স্ত্রী তখনও একটানা কাঁদিয়া চলিয়াছে। পিসিমা উপবাস করিয়া আছেন সারাদিন।

পরদিন সকালবেলা নিবারণ মজুমদার-বাড়িতে যায়। শশধর নিবারণকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিয়া বলেন, আপনি যা করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। আসা অবধি নানা জনের কাছ থেকে আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। দেখা হয়ে আনন্দ পেলাম।

আপ্যায়নে সঙ্কুচিত হইয়া একটু অপ্রতিভ ভাব লইয়া নিবারণ উত্তর দেয়—না না, ধন্যবাদের এমন আর কি করেছি আমি। যোগাযোগ—যোগাযোগ ছাড়া কিই বা একে বলা যেতে পারে!

শশধর নিবারণের সহিত বসিয়া বসিয়া দেশের ও দশের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। কথার শেষে বলেন, বাবাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব ঠিক ক'রে ফেলেছি, কালই যাব। কাজকর্ম কত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

নিবারণ আনন্দিত হইয়া বলে, খুব ভাল কথা। একা একা বড্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন। আপনার কাছে গিয়ে শান্তি পাবেন।

বীণা আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু কিছুতেই সে সেখানে থাকিতে পারে না। নিবারণের দৃষ্টির সম্মুখে কেন যেন সে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। এমন নিষ্পাপ চোখ পরিণত বয়সের কোন যুবকের মধ্যে সে বোধ করি

দেখে নাই এতদিন। যত রাজ্যের লজ্জা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরে যেন, সে পাশের ঘরে চলিয়া যায়।

সকলের সঙ্গে নিবারণ চা ও জলখাবার খায়। পান হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া বলে, আচ্ছা, এখন আসি। ও-বেলা আসব আবার।

যাইতে যাইতে সে শুনিতে পায় বীণা জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই ভদ্রলোকটি কে দাদু? পাটা একটু খোঁড়া, না?

ইনিই তো নিবারণ মাস্টার, শচীনের ভাই।—দাদু উত্তর দেন।

ইনি নিবারণবাবু!—বীণার কথায় বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পায়।

ভারাক্রান্ত মন লইয়া চলিতে চলিতে নিবারণ ভাবে—সে খঞ্জ, কদাকারও বোধ হয়। কিন্তু সে পাটিকে কি করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে সে খোঁজ তো কেহই লয় না। কেন? কেহ তো জানে না, কাহার জন্য কিসের জন্য তাহার এই অঙ্গহানি! চিন্তা করিয়া দুঃখ পায় নিবারণ। যন্ত্রণা অনুভব করে, সমবেদনা প্রত্যাশা করে সকলের নিকট হইতে। গতি মন্দ হওয়াতে সে দাঁড়াইয়া পড়ে। তারপর যেন তাহার ভুল ভাঙিয়া যায়। ভাবে, সুস্থ সবল ও সক্রিয় মন যাহার আছে তাহার আবার দুঃখ কিসের, ভুল ভাবিয়া কষ্ট পাওয়া বৃথা।

গতি পুনরায় চঞ্চল ও ত্রস্ত হইয়া উঠে।

সেদিন সন্ধ্যার পর নিবারণ যখন ডাক্তারবাবুর বাসায় পৌঁছিল, তখন সেখানে ভূপালীর আলাপ চলিয়াছে। বীণা সেতারে আলাপ করিতেছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ না করিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া নিবারণ বহুক্ষণ ধরিয়া সে আলাপ শোনে। কি অপূর্ব মূর্ছনা, কি অপূর্ব শিক্ষা! সুরকে লইয়া যেন খেলা করিতেছে বীণা।

আলাপ শেষ হইলে ঘরে ঢোকে নিবারণ। বউদির মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলেন, যাক্, এলেন তা হ'লে!

ভেবেছিলাম বোধ হয় আর এলেন না, ভুলেই গেছেন বোধ হয়। যে ভোলা মন আপনার! শচীনবাবুও সঙ্গে ছিলেন না। যাক্, এলেন তবে।

না, ভুলব কেন? আন্তরিকতার ডাকে শুনি নাকি ভগবানও সাড়া দেন, আমি তো কোন্ ছার!—বাধা দিয়া বলে নিবারণ। বলিয়া হাসিতে থাকে। ঘরময় হাসির ধুম পড়িয়া যায়।

হাসি থামিলে শচীন বলে, কি যে তুমি হারালে দাদা! আর একটু আগে এলে শুনতে পেতে। বীণা তাড়াতাড়ি হাসিয়া বলে, সীজার সিগারেট বোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাসির রোল পড়িয়া যায়। নিবারণ বীণার দিকে তাকায়, সহজ সরল শিশুর মত দৃষ্টি। বীণার আবার সেই সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে। তাহা লক্ষ্য করে নিবারণ। ইচ্ছা করিয়া সে যেন রাণুর খোঁজ করিতে আরম্ভ করে—রাণু কোথায় বউদি? রাণু? তারপর নিজেই ডাকিতে থাকে—রাণু, ও রাণু, এই দেখ আমি এসেছি।

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রাণু ছুটিয়া আসে, কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া সে থামিয়া যায়। নিবারণ ধরিতে গেলে শরীরটাকে একটু টানিয়া সরাইয়া লইয়া বলে—না, যাব না। যাব না আমি।

আসবি না? দাঁড়া।—বলিয়া নিবারণ জোর করিয়া রাণুকে কোলে তুলিয়া লয়, অনেকগুলি চুমু খায় গালে।

বউদি অনুরোধ করিয়া বলেন, নিন বীণা দেবী, আর একটি গৎ আরম্ভ করুন এবার। এই যে দেখুন আপনাদের ডাক্তারবাবুও এসে হাজির। নিবারণবাবুও তো শোনেন নি! নিন, আরম্ভ করুন!

ডাক্তারবাবু একটু অপেক্ষা করিয়া পোশাক ছাড়িবার জন্য অন্য ঘরে চলিয়া যান। বীণা খাম্বাজের আলাপ শুরু করে।

কিন্তু আলাপ আর জমে না যেন। কেন যেন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে বীণা, আঙুলে জড়তা দেখা দেয়। হাত বারে বারে কাঁপিয়া

যায়। কোন রকমে আলাপ শেষ করিয়া সে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকে, নিবারণের দিকে তাকাইতে কেন যেন লজ্জা পায় সে।

নিবারণ রাণুকে কোলে লইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া যায়। একটি আরামকেদারা দেখিয়া বসিয়া পড়ে। মিথ্যা করিয়া বলে—বউদি, এখানে বেশ হাওয়া, বাইরে ব'সে থাকি। যা গরম পড়েছে।

বউদি কিন্তু অন্য রকম ধারণা করেন, তিনি মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে থাকেন।

বাড়ি ফিরিয়া শচীন পিসীমার নিকট বীণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। নিবারণ কোনও কথা বলে না।

সেদিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত নিবারণ জাগিয়া থাকে। বাহিরে জ্যোৎস্নায় পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বাতাসের স্পর্শ উষ্ণ শীতল। তাহার সহিত ফুলের একটা মৃদু গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণচূড়া-গাছের ডালে বসিয়া কি একটা পাখি থামিয়া থামিয়া কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠে—বড় সুন্দর সেই কাকলি। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলি একটানা শব্দ করিয়া চলে, মাঝে মাঝে পেচকের বিকট চীৎকার অশুভ হইলেও শুনিতে মন্দ লাগে না। দূরে—বহুদূরে সাঁওতাল-পল্লীতে মাদলের সহিত তালে তালে নৃত্যগীত চলে, বাঁশী বাজে স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। নিবারণের মনে হয়, রাত্রিটি যেন তাহার মনে এক আবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারে না। ভাবিয়া পায় না, কেন এমন হইল! জীবনের এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ভিতর কখনও তো এমন হয় নাই। এপাশ ওপাশ করে নিবারণ, তারপর আপন মনেই বলিয়া চলে—প্রকৃতির নিয়মে সকলের মত আমার মনেও বসন্ত এসেছে। বসন্ত এল; কিন্তু একটু দেরিতে নয় কি? তা আসে আসুক, অমন এসেই থাকে। সে গুনগুন করিয়া গান ধরে—

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে !

অবিনাশেরও ঘুম হইতেছে না। আগামী কল্য এই গৃহ হইতে বোধ হয় জন্মের মত চলিয়া যাইবেন, যে গৃহ হইতে তাঁহার ন্যায় আরও অনেকে চলিয়া গিয়াছেন আর ফিরিয়া আসেন নাই। এ বাড়ি হইতে চলিয়া যাইবার পর তিনিও একদিন সেই অজানা দেশে গিয়া তাঁহাদের দলবৃদ্ধি করিবেন। অবিনাশের মন ব্যথিত হইয়া উঠে। সেই ব্যথা যেন কোন প্রিয়জনকে হারাইবার মত বড় প্রাণে বাজে। মনে হয় ইহা যেন আত্মার দেহ হইতে অনির্দিষ্ট অসীমের পথে যাত্রা। তবে কি আত্মারও দেহ ছাড়িয়া যাইতে এইরূপ কষ্ট হয় ? শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মায় পার্থিব দেহ-সঞ্জাত কামনা কি স্পর্শ করে ? কে বলিবে !

তারপর নিস্তারিণীর কথা মনে পড়ে, আর মনে হয় নীরদার কথা। নীরদা না থাকিলে তিনি বাঁচিতেন কি করিয়া ? নীরদাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে মনে করিয়া বৃদ্ধের যেন কষ্ট হয়।

অবিনাশ উঠিয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে সেতারখানি হাতে তুলিয়া লইলেন তারপর আলাপে আলাপে তন্ময় হইয়া গেলেন তিনি। বেণু বীণা যে কখন তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তিনি লক্ষ্যও করেন নাই। আলাপ শেষ হয়। ঝাউগাছগুলির দিকে স্বপ্নাবিষ্টের মত তাকাইয়া থাকেন বৃদ্ধ। বেণু বীণা আর হাসি চাপিতে পারে না, তাহারা হাসিয়া ফেলে। পিছন ফিরিয়া তাহাদের দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠেন—এই চোরেরা, কি হচ্ছে ? হাসিয়া হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলেন—এস ভাইরা, এস। তোমরা ঘুমোও নি এখনও ? তাহারা কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন লাগল বল তো এবার !

মালকোশ, না দাদু ? চমৎকার লেগেছে কিন্তু।—উত্তর দেয় বীণা।

বেণু বলে—তোমার হাত কি মিষ্টি দাদু, এখনই এমন, আগে না কেমন ছিল !

পরদিন যাইবার সময় নীরদা ঠাকুরাণীর কথা মনে করিয়া অবিনাশ বাঁকিয়া বসিলেন, তিনি যাইবেন না। শশধর ছাড়িলেন না। বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নয়টার গাড়িতে বৃদ্ধকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন তিনি। চোখের জল লইয়া দিদিমাই কেবল জনকপুরের বাড়িতে থাকিয়া গেলেন।

বৃদ্ধার যেন এতদিন পরে বেশি করিয়া ভাদুড়ী মহাশয়ের কথা মনে পড়িতে থাকে। জীবনের সায়াহ্নে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুমোচন করেন নীরদা ঠাকুরাণী।

স্কুলে যাইবার পথে নিবারণ একবার দিদিমাকে দেখিয়া আসিতে যায়। চোখের জল মুছিতে মুছিতে অবিনাশের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন নীরদা। নিবারণ ভাবে, এই বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ উভয়েই একই প্রকার অসহায় অবস্থার ভিতর দিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য কামনা করিতেন। তাঁহাদের ভিতর নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেন, একজন অপরজনের মনের অভাব অনেকখানি পূরণ করিতেন, তাঁহাকে লইয়া ভুলিয়া থাকিতেন। একজনের জীবনে যখন আশা নূতন করিয়া দেখা দিল, তখন অপর জনের জীবন সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া গেল।

শূন্য গৃহগুলির দিকে নিবিষ্টমনে নিবারণ তাকাইয়া থাকে, কি যেন দেখে সে। মনে হয়, কে যেন দুই-একদিনের ভিতর পুরাতন বাড়িটির প্রতিটি রন্ধ্র স্মৃতিতে স্মৃতিতে ভরিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অন্তরের শূন্যতা কি স্মৃতিতে পূর্ণ হইতে পারে? সে কি তৃপ্ত হয়, কে জানে! নিবারণের মনে হয়, যেন বিস্মৃতিই ভাল।

স্কুলে বিশ্রামের ঘণ্টায় সে শশধর ও স্নেহলতার কথা বসিয়া বসিয়া

ভাবে। তাহাদের জীবনের আদর্শ ও সারল্য তাহাকে মুগ্ধ করে। একদিনের পরিচয়ে কিই বা এমন সে বুঝিতে পারিয়াছে, তবুও চিন্তা করিতে করিতে নিবারণের মন যেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া যায়। অবিনাশের চরিত্রের দৃঢ়তা ও তাহার বিজ্ঞানসম্মত পরিবর্ত্তনের কথা মনে করিয়া সে প্রশংসা করে। সকলের শেষে কিংবা প্রথমে তাহা সে মনে করিতে পারে না, তবে বেণু বীণাকে সে তাহার চিন্তার ভিতর দেখিতে পায়, তাহাদের স্মৃতি লইয়া রোমন্থন করিতে তাহার ভাল লাগে। কিন্তু বীণাকে সে পৃথক করিয়া ভাবিতে গেলে কেমন যেন লজ্জিত ও পুলকিত হইয়া উঠে।

স্কুলের ছুটির পর ডাক্তারবাবু নিবারণকে তাঁহার বাড়িতে ডাকিয়া পাঠান। নিবারণ সেখানে যায়।

সত্যিই যা মনে করেছি তাই।—নিবারণের মুখের দিকে তাকাইয়া ডাক্তারবাবুকে চুপি চুপি বলেন বৌদি, ধারণাটা ঠিকই করেছি। চায়ের কাপটা সম্মুখে ধরিয়া দিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন—কি ভাবছেন? কথাবার্তা বলছেন না যে বড়? কলকাতায় যাবেন না কি? বউদির ঠোঁটের কোণে সেই দুষ্টামির হাসি দেখা দেয়। ডাক্তারবাবু অন্যদিকে মুখ লইয়া গম্ভীরভাবে বলেন, সকলের জন্যে মন বোধ হয় খারাপ হয়েছে।

কৃত্রিম ক্রোধের সহিত নিবারণ বলিয়া ফেলে—কি যে সব বলছেন আপনি? কথাটা বলিয়া সে হাসিয়া ফেলে। বৌদির মুখটা কেন যেন কালো হইয়া উঠে।

কি যে হয়েছে বৌমা, বুঝতেই পারছি না। কেমন যেন হয়ে গেছে ও। ফিস ফিস করিয়া পিসীমা ও বৌদি আলোচনা করেন।

—বাড়িতে কি করেন?

যেমন চলত সবই, প্রায় আগের মতই চলছে। তবে কথাটা একটু

কম বলে। হ্যাঁ শোন, এর ভেতর কলকাতায় গিয়েছিল একবার। আজ রবিবার না? মজুমদার মশায়রা গেছেন আজ হ'ল তোমার গিয়ে এগার দিন না? হ্যাঁ, ঠিক ও গিয়েছিল বুধবার, ফিরেছে পরশু। ফিরে এসে বললে, পিসীমা, দাদু ভালই আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, বেণু বীণার সঙ্গে দেখা হ'ল রে? বললে, হ্যাঁ, হয়েছে। বৌদি হাসেন, ঠোঁটের কোণে সেই চাপা হাসি। সে হাসি পিসীমাও লক্ষ্য করেন, কিন্তু বলেন না কিছু।

কি করছেন?—ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বৌদি প্রশ্ন করেন—আপনারা তো আর না ডাকলে যাবেন না, তাই নিজেই একবার চ'লে এলাম। একই দেশের লোক, তার ওপর আবার জ্ঞানী গুণী, ভাব সাব রাখা দরকার—বিদেশে বিভূঁয়ে থাকা। বৌদির কথাবার্তায় সহজ পরিহাসের ভাব ফুটিয়া উঠে। নিবারণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলে।

শচীন আসিয়া দাদার কাছে বসে, বলে—বৌদি, দাদা আজকাল পড়াশুনায় খুব মন দিয়েছে। আমাকে বলছে--শচীন, প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষাটা দেব, তুই আমার পড়াটা দেখিয়ে দে। নিবারণের কাঁধের উপর একটু মৃদু চাপ দিয়া হাসিতে হাসিতে বলে—আপনি এ কথা বিশ্বাস করলেন বৌদি? ওঁকে পড়াব আমি? উনি যা জানেন তাতে আমার মত দশটাকে উনি পড়াতে পারেন এখনও।

এ কথায় সকলে হাসিয়া উঠে, নিবারণও লজ্জা পায়। বৌদি একটি চেয়ারে বসিয়া বলেন—এখন বি. এ.-টিয়ে ওসব রেখে দিন তুলে নিবারণবাবু। ছাপ নিয়ে আর কি হবে? আমরা জানি, কত আলোচনা হয়েছে আপনার সম্বন্ধে। এবার একটা বিয়ে ক'রে ফেলুন, কেমন? দেখুন না পিসীমার অবস্থাটা, আর কতদিন টানবেন আপনাদের?

তারপর নিবারণের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখের দিকে

তাকাইয়া বৌদি প্রশ্ন করেন—কি, কথা বলছেন না যে? বিয়ে করবেন না?

পিসীমা চা তৈয়ারী করিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেলে নিবারণ মুখ তোলে। ব্যথায় কাতর সে মুখ। থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে সে বলিতে থাকে—বৌদি, আমি জানি, আমি বুঝি সব। নর ও নারীকে নিয়েই যে মানুষের সম্পূর্ণ ছবি, সে কথাও স্বীকার করি। নারীমন অজানা থাকলে মানুষকে ঠিক ভাবে জানা যায় না। বিয়ে করলে সেটা খানিকটা সম্ভব, আমার পক্ষে দরকারও যে আছে তাও আমি ভাবি। কিন্তু বিয়ে করব কাকে? কিসের জন্যে? আমি জানি বৌদি, অবিবাহিত মানুষ অসম্পূর্ণ। তার সৃষ্টির ভিতর সৌন্দর্যের উচ্চ আদর্শ ব্যাহত হয়। তার কাজগুলিও প্রাণহীন অথবা নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে, সে সম্ভাবনাও রয়েছে।

ভাল মেয়ে যদি পাওয়া যায়, উপযুক্ত মেয়ে। তা হ'লে?—উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন গৌরী।

ভাল মেয়ে, উপযুক্ত মেয়ে এ সব কথা কিছু বুঝি না বৌদি। আমি বুঝি শক্তি অথবা প্রেরণার উৎস যাই বলুন, তাই? আমার সৃষ্টির পথে কর্মের পথে যে আমাকে প্রতিনিয়ত শক্তি জোগাবে, যে আমাকে ডেকে বলবে—বৃহত্তর পৃথিবীতে তুমি তোমাকে বিলিয়ে দাও, সেবা-প্রেমের ভিতর দিয়ে তুমি মুক্তি খুঁজে নাও—আমাকেও মুক্ত কর। ভগবানের ইচ্ছে না হ'লে সে রকম যোগাযোগ কি সম্ভব বৌদি, তেমন কি খুঁজে পাওয়া যায়?

বৌদি মাথা নাড়িয়া বলেন—না, তা পাওয়া যায় না। তবুও এমন আদর্শ তো অনেকেরই ছিল, আছেও অনেকের। তারাও তো করেছে।

সামান্য শান্তির আশায় তারা কি করেছে, ভুল করেছে কি ঠিক

করেছে তা বলতে পারি না। আদর্শটা ঠিক রাখতে পারলেই ভাল। এমন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নাই বা খুঁজলাম বৌদি।

আসল কথা হচ্ছে, আপনি ঝুঁকি নিতে চান না।—ক্ষুণ্ণ ভাবে বলেন গৌরী।

তা যদি মনে করেন তাই। তবে এখানকার পথ-হারিয়ে-যাওয়া পৃথিবীর এই বিশৃঙ্খলার ভিতর পচু, যদু, মধুর মত ছেলে মেয়ে আসবে—তারা কষ্ট পাবে আর নিজেরাও তাদের সঙ্গে কষ্ট পাব, এমন নির্বোধ তো আমি হতে পারি না, হাসিয়া বলে নিবারণ, আমার আর কোন আশা নেই।

আপনার কাছে কোন কথা বলতে গেলেই কেবল কথার কচকচানি। আমার ভাল লাগে না।

ভাল না লাগবারই তো কথা। এত যখন শুনলেন তবে আর একটু শুনুন।

শান্ত প্রবুদ্ধ মন নিয়ে, নিষ্ঠা পবিত্রতা নিয়ে আমি একা চলারই চেষ্টা করছি, করবও শেষ পর্যন্ত। একা একা চেষ্টা ক'রেও তো পরিপূর্ণতা, মুক্তি পেয়েছে অনেকে, পায় নি?

বৌদি সে প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন না, তন্ময় হইয়া কি যেন ভাবেন তিনি। তারপর মনে হয় ঘরের এই গম্ভীর পরিবেশকে যেন লঘু করিবার জন্যই নিবারণ কৌতুকের সহিত বলিয়া উঠে—খোঁড়া মানুষকে কে বিয়ে করবে, খোঁড়াকে? যে বিয়ে করবে সে মনে মনে এই ভেবে হয়তো কষ্ট পাবে যে, তার স্বামী খোঁড়া।

শচীন হাসিয়া উঠে। বৌদি ভাবেন, এ পাগলকে লইয়া তিনি কি উপায় করিবেন?

বৌদিকে নিবারণের খুব ভাল লাগে। যাতায়াতে ক্রমে ক্রমে আত্মীয়তার ভাবটা নিবিড় হইয়া উঠে। ইহা শিক্ষক মহাশয়দের

আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। আলোচনা নিবারণের অসাক্ষাতেই চলে।

মাসে একবার কি দুইবার নিবারণ কলিকাতায় যায়। অবিনাশকে দেখিয়া আসে। স্কুলের কাজে মাঝে মাঝে কাগজপত্র দেখাইতেও যায়। নিবারণ বৃদ্ধের সহিত দেখা করিতে গেলে বীণা বসিবার ঘরে দুই-একবার আসে, দুই-একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে কোন কোন বার। কিন্তু প্রতিবারেই সে আসে। ইহা হয়তো বীণার নিছক কৌতূহল। কে জানে কেন সে আসে?

কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর প্রত্যেক বারই বৌদি জিজ্ঞাসা করেন—বেণু বীণা কেমন আছেন, ও নিবারণবাবু? দেখা হ'ত তো?

নিবারণ মুখখানি নীচু করিয়া উত্তর দেয়—হ্যাঁ, হয়েছে। সে কথায় বৌদি কেবল হাসেন, ঠোঁটের কোণের বাঁকা হাসি। অনেক অর্থ তাহাতে যেন মিশানো থাকে।

দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটি আসিয়া পড়ে। বউদি সেদিন নিবারণবাবুর বাসায় বেড়াইতে আসেন। মনে আনন্দ ধরে না যেন আর।

আপনার কোন আশা নেই, বুঝলেন নিবারণবাবু?—কথা বলিতে বলিতে গৌরী ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন।

সে কথা কি আপনি এতদিনে বুঝলেন বৌদি? গৌরী এতক্ষণ পিসীমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, নিবারণ তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সে একবার ভাবিয়াছিল, বৌদি হয়তো এখনই তাহার ঘরে আসিয়া পড়িবেন। আসিয়া বৌদির মুখের দিকে একবার তাকাইয়া চেয়ারটা ইসারায় দেখাইয়া দিয়া অঙ্কের খাতার দিকে মনোযোগ দেয় নিবারণ। পাশে ছাত্রটি একবার উসখুস করিয়া বসে।

আচ্ছা, আপনি কি, বলুন তো? কটা বেজেছে তার খেয়াল আছে? এমন অন্ধকারের মধ্যে ব'সে—

অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজছি, জ্ঞানের আলো। তাই না রে বিজয়?

বিজয় জোরে জোরে মাথা নাড়ে।

থাক্, বেচারাকে আর কষ্ট দিতে হবে না। পিসীমা বলিলেন, দুপুর থেকে আরম্ভ হয়েছে। তুই যা তো বাবা। এখন তো ছুটি, কাল আসিস দুপুরে।

বিজয় চলিয়া গেলে বউদি বলেন, চলুন, রাখুন খাতাপত্র, বাইরে গিয়ে বসি একটু।

না বউদি, ভেতরেই বসি। আকাশে মেঘ থাকলে আমার মন ভাল লাগে না।—বিব্রতভাবে বলে নিবারণ।

আকাশে মেঘও থাকে, রৌদ্রও থাকে, দুটোই ঠিক। আপনার মত আমি কবি নই, যদিও দেখতে ভাল লাগে আমার। উঠে পড়ুন।

বেতের চেয়ার দুইটি হাতে করিয়া নিবারণকে অগত্যা বারান্দায় আসিয়া বসিতে হয়। রান্নাঘরের বারান্দায় পিসীমা পৈতা তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত। গৌরী বলেন, আচ্ছা, আপনি কি বলুন তো?

আমি যে কি তা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, আর বুঝেই বা লাভ কি বলুন? ও নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল, মাথাটা বিশ্রাম পায়।

আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কেবল সব বুড়োমি বুড়োমি কথা। সব সময় লাভ লোকসান যাচাই ক'রেই মানুষ চলে নাকি? আমোদ-আহ্লাদ ব'লে কি কোন জিনিসই নেই?

চ'টে গেলেন যে বড়! তা আর থাকবে না কেন, নিশ্চয়ই আছে। কেন, হাসতে কি আমি কারও থেকে কম জানি, না কি?

না, হাসতে আপনি কম জানেন না, হেসে উড়িয়ে দিতে জানেন—মনকে ফাঁকি দিতে জানেন।

তবু রক্ষা। মনটা আমার কিনা, তাই অপর কাউকে ফাঁকি না দিয়ে নিজের মনকেই ফাঁকি দিতে চেষ্টা করি। তবে স্বীকার করছি তাও পেরে উঠি না সব সময়।

এ চেষ্টা কেন করেন নিবারণবাবু? ক'রে লাভ কি?—মিনতির সহিত কথাগুলি বলিয়া গৌরী নিবারণের মুখের দিকে তাকাইয়া সাগ্রহে উত্তরের অপেক্ষা করেন।

নিবারণ হাসে একটু, মুখখানি করুণ করিয়া বলে, লাভ-লোকসানের খতিয়ানটা শুধু আমিই করি না, আপনিও করেন দেখা যায়। শুনুন বউদি, অনেক কাজ বাকি আছে যে, তাই মনের দাবীগুলিকে কোন রকমে বুঝ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। আর মনে করুন যদি ফাঁকিই দিই, তবে লাভ না হোক ক্ষতিও কারও হচ্ছে না। কি বলেন?

হচ্ছে না বটে, কিন্তু নিজের জীবনটাই বা এত ছোট কিসের; তাকেই বা এত তুচ্ছ করা কেন?

তাকে অনেক বড় ক'রে দেখেছি ব'লেই তো মাতি না। এক একজনের দৃষ্টিভঙ্গী এক-এক রকমের, কেমন কিনা? সব লোকই কি এক রকমের হয়? ব্যতিক্রম থাকবেই থাকবে। ব্যতিক্রমের দলে পড়তে আমার তো বেশ লাগে।

গৌরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—আমার কাছেও ভাল যে না লাগে তা নয়, বুঝিও সব। তবু কেন যেন আপনাকে আর একটু অন্য রকমভাবে দেখতে ইচ্ছা করে।

হাসিয়া বলে—সে কথা আমিও বুঝি। আপনার মাঝে মাঝে এমন ভাবে চড়াও হওয়াটাও খুব ভাল লাগে, নিজেকে খুব বড় মনে হয়, মনটাকে শক্ত করবার ফুরসুৎ পাই। আপনি আমার মনের রঞ্জন-রশ্মি।

গৌরী না হাসিয়া পারেন না। চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বলেন—তাই নাকি? ভাবছি এক রকম, আর কাজের বেলায় হচ্ছে অন্য রকম। তবে তো আর এসব কথা বলা চলবে না আপনাকে।

নিবারণের মুখ অকস্মাৎ ম্লান হইয়া যায়। মুখ নীচু করিয়া বলে—আপনি না বললে আমাকে আর কে বলবে, বৌদি? শচীন পিসীমাও বলে, স্নেহের ঝঙ্কার তার ভিতরও থাকে কিন্তু রেশ থাকে না মনে। আপনার কথার রেশ থাকে মনের ভিতর।

ভারি ভাগ্যি আমার, কৃতার্থ হলাম। নিন নিন, বাইরের এই কাঠখোট্টা ভাবটা ছেড়ে দিন তো। আর সবই ভাল আপনার।

সব ভাল থাকলে চলে না ব'লেই তো একটা খারাপ আছে। যাক, শুনুন এবার। প্লাবনের মুখে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অপমৃত্যু বরণ না ক'রে বুদ্ধিমানের মত একটু দূরে স'রে দাঁড়িয়ে দেখতে চাই।

নাই বা হ'ল সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যারা ঝাঁপ দেবে ব'লে স্থির করেছে তাদের একটু তৈরি ক'রে দিই না।

বা রে বা, ভারি মজার কথা তো! আবর্তে হাবুডুবু খেলে কেমন লাগে যে জানে না, কি ক'রে বাঁচতে হয় যার কোন ধারণা নেই তার কথা কে শুনতে যাবে? শুনে লাভ কি? জীবনটা তো আর ফরমূলায় বাঁধা অঙ্ক নয়। এ অঙ্ক ক'ষে যেতে হয় অনবরত আর লক্ষ্য রাখতে হয় কোথাও যেন অমিল না হয়, অসামঞ্জস্য না আসে। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগগুলো যেন ঠিক ঠিক হয়। ভেবেছিলাম আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, এখন দেখছি—

সে ধারণা আমারও কিন্তু ছিল বউদি।—নিবারণ হাসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু গৌরীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইতেই তাহার হাসি কোথায় যেন মিলাইয়া যায়। থামিয়া বলে—ভাবছি কোথায় যেন একটু গোল র'য়ে গেছে। অভিজ্ঞতার জন্যে ঝাঁপ দেওয়া, আর ঝাঁপ দিতে

ভাল লাগে ব'লে সকলের দেখাদেখি ঝাঁপ দেওয়া—দুটো দু রকম কথা যে!

গৌরী কৃত্রিম ক্রোধের সহিত উত্তর দেন—নিন, ঢের হয়েছে, থামুন এবার। কেবল বক্তৃতা—বক্তৃতা আর বক্তৃতা। আপনার মত কাপুরুষ আমি দুটো দেখি নি জীবনে, আর এমন বোকা।

প্রয়োজন হ'লে চালাকও আমি হতে জানি। সুগার-কোটেড কুইনাইন দিয়ে জ্বর ছাড়াবার মত চালাকি আমি অনেক করেছি নিবারণ হো-হো করিয়া হাসিতে থাকে।

গৌরী যেন হাল ছাড়িয়া দেন, বলেন—আপনাকে ব'লে কোন লাভ নেই, আর বলব না। যা বলতে ছুটে এলাম এত ক'রে, তাও না ব'লে ফিরে যেতে হ'ল দেখছি। লাভ কি বলে?

আমাকে না ব'লে কি আপনি থাকতে পারবেন? ভাবছেন একটু অনুরোধ করি বলতে। ব'লে লাভ না থাকলেও লোকসান হবে না, এ আশা রাখতে পারেন। বলুন বলুন, মনোযোগ দিয়ে আপনার কথা শুনব, বলুন বউদি।

গৌরী কি যেন চিন্তা করিয়া উৎসাহিত বোধ করেন, বলেন—একটা সুসংবাদ আছে। কিন্তু এমন বোকা-বোকা ভাবটা ছাড়তে হবে।

যেটা দুঃসংবাদ নয় সেটাই আমার পক্ষে সুসংবাদ। কিন্তু এ সংবাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা এমন কি যে তা শোনবার জন্য অতবড় একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে?

কথায় বৃহস্পতি, কিন্তু কাজের বেলা অষ্টরম্ভা।

কি এমন সুসংবাদটা শুনি না বউদি। কাজের বেলা এলে তার পরেই না হয় বলবেন ও-কথাটা।

কি খাওয়াবেন, বলুন?—গৌরী যেন রীতিমত রহস্যময়ী হইয়া উঠেন।

শ্রোতার উপর নির্ভর না করলে বিচারে ভুল হ'তে পারে। শ্রোতা এবং বিচারক হিসেবে তৃতীয় শ্রেণীর নই, এ বিশ্বাস আপনার আছে নিশ্চয়। পারিশ্রমিকটা সেই হিসেবে পাবেন।

তবুও দেখুন সোজাসুজি জবাবটা দিলেন না।

বোকা কিনা, তাই। যাক, এক ঘণ্টা ধ'রে অনেক চেষ্টা তো করলেন উপক্রমণিকার, বাকি তো কিছুই রাখলেন না, এবার ব'লে ফেলুন দেখি।—নিবারণের মুখে কৌতুকের ছাপ ফুটিয়া উঠে।

ভস্মে ঘি ঢালা! শুধু ডুগি তবলার বোলের মত তালে ঠিক রেখে কথা ব'লে যেতে পারেন, আর তা শুধু আমারই সঙ্গে। রসকষ একটুও নেই তাতে। হতাশ ভাবে কথাগুলি বলিয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া গৌরী ঠিক হইয়া বসেন। নিবারণ বলে—কি করব, অভ্যাস হ'য়ে গেছে কিনা, তাই 'তেরে'র পরে 'কেটে'টা আপনা থেকেই এসে যায়। স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে এখন, চেষ্টা ক'রে ফল নেই। বাইরের আঘাতে আমি সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ি বেশি। তবে আপনার এত আগ্রহ দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় ছেড়ে দিই মনটাকে একটু।

বেশ তো দিন না ছেড়ে, সময় তো হয়েছে। ছুটিতে তো আসছে তারা, চিঠি পেলাম আজ।

কারা?—ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলিয়া নিবারণ মুখ নীচু করে। বেণু বীণা আসিতেছে। বৌদির কথাবার্তার ভিতরে যে গোপন ইঙ্গিত ছিল তাহা এতক্ষণে স্পষ্ট হইয়া উঠে, সে লজ্জা পায়। বৌদির ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্ন হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে।

কি, চুপ ক'রে রইলেন যে? আপনি কলকাতায় গেছেন আট-দশবার, আর তারা একবার আসতে জানে না?

আমি কি তাদের কাছে গিয়েছি না কি? দেখা করবার ইচ্ছাটা

যে ছিল না তা নয়, তবে তাদের কাছে তো আমি যাই নি।—অপ্রতিভভাবে কথাগুলি বলে নিবারণ।

গৌরী মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসিতে থাকেন। তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠে।

হাসছেন যে বড় ? এমন কি বলেছি আমি ?

হাসির বেগ থামাইয়া গৌরী বলেন—না, কিছু বলেন নি আপনি, এমনই হাসছি। বীণা ঠিকই লিখেছে, বড় লাজুক আর নাকি মুখচোরা আপনি।

মুখচোরা তো নই-ই তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আর ঠিক যতখানি লাজুক হওয়া দরকার ততখানি লাজুক আমি—এ কথাটাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লেখা উচিত ছিল। কিন্তু বউদি, কেন আসছেন তাঁরা ?

এদিকে তাদের সম্বন্ধে আপনার আগ্রহের যে অন্ত নেই তাও বুঝতে পারি, তবুও কত কথা আপনি গোপন করবার চেষ্টা করেন আমাকে বুঝতে পেরেও এমন কেন করেন বলুন তো ?

বাঃ রে, কি গোপন করলাম আমি ? তাঁদের আগ্রহ আছে এত, আর আমার একটু থাকবে না ? না না, গোপন আমি করি না কিছু। তবে প্রকাশ করি না, কারণ প্রকাশ ক'রে লাভ নেই।

কি ক'রে বুঝলেন—লাভ নেই ?

বেশ মজা তো, আমার মনকে আমি বুঝি না ? মনটা প্রস্তুত কি অপ্রস্তুত সে ধারণাটাও কি আমার নেই ?

আপনার মনটা একটা বাজে মন। ভাবে-ভরা দুর্বল, রুগ্ন মন। আমি বুঝেছি সব, কিন্তু এমন করলে আর আসব না আমি, জেনে রাখুন।

গৌরীর এই কথাগুলিতে নিবারণ যেন ব্যথা পায়। তাহার মুখ বিমর্ষ হইয়া উঠে, কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াও যেন বলিতে পারে না।

মুখের সেই অসহায় ভাব লক্ষ্য করিয়া বউদি হাসিয়া ফেলেন, বলেন, মনের এই বিপর্যস্ত অবস্থাটা কেমন লাগছে বলুন? অভিজ্ঞতা বাড়ছে না?

বাড়ছে বইকি। হয়তো দরকার ছিল তাই। মনে হয় আমি যেন নিবে আছি, আপনি তাই ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু ফল এর ভাল হবে না দেখবেন।

যেটা করবার দরকার আছে তা আমি করবই করব। আমারও তো মন ব'লে একটা পদার্থ আছে নিবারণবাবু। ভাল না হোক, খারাপ তো আর কিছু হবে না।

আকাশের দিকে হঠাৎ লক্ষ্য পড়ায় গৌরী ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠেন—মেঘটা দেখছি কালো হয়ে উঠল। আশ্বিনের মেঘ, অসময়ের মেঘ ঝড় উঠতে পারে। চলুন, পৌঁছে দেবেন। অনেক দিন যান নি আমাদের বাসায়। যাতায়াত কম ক'রে দিলেন কেন?

গৌরী উঠিয়া পড়িলে পিসীমা আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া বলেন—তা হ'লে চললে আজ? রাণুকে তো আন নি বউমা, সে কোথায়?

তারা সব বেড়াতে গেছে স্টেশনের দিকে। নার্স চারুবালাকে ধরলাম তিনি এগিয়ে দিয়ে গেছেন, আর পৌঁছে দেবেন নিবারণবাবু।

পিসীমা হাসিয়া বলেন—তোমরা দুজন জুটেছ ভাল। পরশু থেকে তো আরম্ভ হবে খুব হৈ-চৈ। সেবার তো বুড়োর অসুখ ছিল, তাই বিশেষ সুবিধে হয় নি তোমাদের।

নিবারণ পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতে দিতে বাহির হইয়া আসে। গৌরী মুখখানি হাসি হাসি করিয়া পিছনে চলিতে চলিতে প্রশ্ন করেন—শচীনবাবুকে তো দেখছি না ক'দিন ধ'রে, কোথাও গেছেন না কি?

হ্যাঁ, কলকাতায় গেছে পরীক্ষার খোঁজ খবর নিতে। আজকালের ভেতরই এসে পড়বে।

পিচ-ঢালা বড় রাস্তায় উঠিয়া গৌরী বলেন—সব রাস্তাই যদি এমন সুন্দর আর সরল হ'ত, কি বলেন নিবারণবাবু ?

নিবারণ মুখ না তুলিয়াই উত্তর দেয়—তা হ'লে অনেকেরই হয়তো নিবারণকে আর দরকার হ'ত না।

গৌরীর মুখ নিমেষের মধ্যে কালো হইয়া যায়। মনের ভিতর কি যেন তিনি রোধ করিবার চেষ্টা করেন। নিবারণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলে—বিচিত্র অনেক অনুভূতি আসে মনে, সবগুলিই তৃপ্তির তাগাদা নিয়ে আসে। কিন্তু কল্যাণ অকল্যাণের রূপটা সামনে রেখে তা বিচার করতে হয় বৌদি।

গৌরী হাসিয়া উঠেন। অপ্রস্তুতের ভাব লইয়া নিবারণ বলে—হাসলেন যে বড় ? আমি হেসে উড়িয়ে দিতে চাই, আপনি চান ঢেকে ফেলতে।

গৌরী উত্তর দেন—যাই হোক, হাসা কাঁদা জিনিসটা ভাল যদি সকলে মিলে একসঙ্গে হাসা কাঁদা যায়, কি বলেন ?

হাসপাতালের পথে নামিয়া গৌরী বলেন—পরশু বিকেলে স্টেশনে গিয়ে তাঁদের নামিয়ে আনবেন, ভুলবেন না যেন।

আচ্ছা।

নিবারণ যেন বৌদিকে বুঝিয়াও সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

নিবারণ স্টেশনে গিয়া দেখে, তেওয়ারীকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাধর দত্ত প্ল্যাটফরমের উপর অপেক্ষা করিতেছে। তাহার কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। একবার ভাবিল, উহারা দেখিবার পূর্বে সরিয়া পড়া ভাল। কিন্তু কি যেন ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত রহিয়া গেল সে।

এই যে, নিবারণবাবু যে, কি মনে ক'রে ? কোথাও যাবেন না কি ?

গঙ্গাধরের সহিত নিবারণের দেখা হইয়া যায়।

না, যাব না। একজন ভদ্রলোকের আসবার কথা আছে তাই।

নিবারণের সাহস নষ্ট হইয়া যায়। সে একটু নিরিবিলি জায়গা দেখিয়া সরিয়া যায়। গাড়ি প্ল্যাটফরমের ভিতর ঢুকিবার সময় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে।

অলক্ষ্যে থাকিয়া দূর হইতে সে দেখে, বেণু ও বীণা ট্রেন হইতে নামিলে গঙ্গাধর আগাইয়া গেল। তেওয়ারী দুইজন কুলীর সহিত জিনিসপত্র নামাইতে আরম্ভ করিল।

বীণা নামিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল, কাহাকে যেন সে খুঁজিতেছে। ভীড়ের মধ্য দিয়া নিবারণের উপর লক্ষ্য পড়িলে সে দেখিল যে, নিবারণ তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। বীণা চকিতে দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

নিবারণ আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বাড়ির পথ ধরিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল সে যেন স্বার্থমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মনে অনাবশ্যক কৌতূহল জন্মিয়াছে। পাপের পথ ইহা। চিত্তবিক্ষোভ দিয়া ইহার আরম্ভ, অনুশোচনা দিয়া ইহার শেষ।

পাপ করিবার অধিকারের কথাও তাহার মনে হইল। সার্বজনীন কল্যাণের জন্য জীবনের সামান্য এই তৃপ্তিটুকু এমন কি দোষের? অসহায়ের মত একা একা চলা অপেক্ষা একজনকে সঙ্গে করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া, সেবা করিয়া সেবা পাইয়া জীবনটা কাটাইয়া দেওয়ার ভিতরও যুক্তি আছে বোধ হয়।

পরদিন দ্বিপ্রহরে বউদি বীণা ও বেণুকে লইয়া নিবারণের বাসায় বেড়াইতে যান। ঘরে ঢুকিয়া বউদি দেখেন, নিবারণ অজিতের অঙ্ক লইয়া ব্যস্ত। ডাকিয়া বলেন, নিবারণবাবু, এই দেখুন, কারা সব এসেছেন!

নিবারণ উৎফুল্ল ভাবে বলে, আরে, আসুন আসুন। শচীন, এই শচীন,

ওঠ্। দেখ্, কারা সব এসেছেন! কেমন কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোচ্ছে দেখুন না। রাতের গাড়িতে আসা কেন রে বাপু!

শচীনের গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে নিবারণ উঠিয়া দাঁড়ায়। শচীন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে, নমস্কার করিয়া বলে, এসেছেন যে সে সংবাদ সকালেই পেয়ে গেছি দত্তমশায়ের কাছ থেকে। ভেবেছিলাম, এ বেলা যাব দেখা করতে। যাক, দেশের দিকে নজরটা পড়ল এতদিনে! দাদু ভাল আছেন তো?

নিবারণ চেয়ারগুলি আগাইয়া দেয়। একটিতে বেণু বসিয়া পড়ে, পাখাটা হাতে লইয়া উত্তর দেয়, হ্যাঁ, ভালই আছেন। বুড়ো তো আমাদের সঙ্গে আসবে ঠিক করেছিল, অনেক ক'রে ব'লে ক'য়ে রেখে এসেছি। যাবার সময় লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। এখানে শালগ্রামের পূজো চলবে। তারপর, আপনাদের কেমন কাটছে বলুন?

উত্তরটা দেয় নিবারণ, বলে, কাটছে কোন রকমে। শচীনটা আছে তাই মনে হয় বেঁচে আছি। দুই ভাইয়ে তর্কাতর্কি চেঁচামেচি ক'রে কেটে যায় খানিকটা।

কথাটা বলিয়া সে শচীনের মুখের দিকে তাকাইলে শচীন হাসিয়া ফেলে। বলে, গলায় জোর থাকলে কথায় যুক্তি না থাকলেও চলে, তাই না দাদা? সে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া যায়।

নিবারণের দিকে তাকাইয়া বীণা সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করে, কাল বিকেলে যেন আপনাকে স্টেশনে দেখলাম মনে হ'ল। গিয়েছিলেন না কি?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। একজন ভদ্রলোকের আসবার কথা ছিল, কিন্তু বড় নিরাশ হতে হয়েছিল।—আমতা আমতা করিয়া উত্তর দেয় নিবারণ। সে বিপদ কাটাইয়া উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে।

কি রকম? আসেন নি বোধ হয়?

না, তিনি এসেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, আমি একাই বোধ হয় তাঁকে আনতে গেছি, তারপর বুঝলাম সে ধারণা ভুল। দেখলাম অনেক লোক তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, তাই ভীড়ের মধ্যে জয়ধ্বনিটা বাড়িয়ে আর লাভ নেই মনে ক'রে পালিয়ে এলাম। ভয়ানক বিপদে প'ড়ে গেছলাম আর কি।

বীণা ভাবে, ইহা স্বীকৃতি। সে মনে মনে নিবারণকে ধন্যবাদ দেয়। বউদি কথাগুলি বুঝিয়া ফেলেন এবং সেই জন্যই জিদ ধরেন—খুলে বলুন না, বুঝতে পারলাম না আমরা। কে সেই ভদ্রলোক?

চোখে মুখে জল দিয়া শচীন ঘরের ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে বলে, বউদি, দাদা আজকাল রীতিমত একজন ডিপ্লোম্যাট হয়ে উঠেছে। ওর কথা বুঝতে আমাকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয় সময় সময়।

তবে রক্ষা এই যে আমার ডিপ্লোম্যাসির ভিতর মিথ্যার নামগন্ধ থাকে না, শচীনের তা থাকে।

বিজয় উসখুস করে। শচীন তাহার অঙ্কের খাতা লক্ষ্য করিয়া বলে, দাদার বিপদের কি অন্ত আছে? ঘণ্টা দেড়েক আগে বলেছিল—বিপদে প'ড়ে গেছে, অঙ্ক মিলছে না। এখনও সে বিপদটা কাটে নি দেখছি।

না, কাটে নি রে। তুই একবার দেখ্ না শচীন।

না, ও বিপদ চলতে থাক্। তুই যা তো বাবা।—বউদি বাধা দিয়ে বলেন।

না না, আমি দেখে দিই। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের ব্যাপার তো। কোথাও হয়তো ভুল র'য়ে গেছে একটু।

বীণা খাতা লইয়া পরীক্ষা করিতে থাকে। রাণুর মৃদু আপত্তি উপেক্ষা করিয়া নিবারণ তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়। রাণুর ওই স্বভাব, ধরিতে গেলে একবার বাঁকিয়া বসা চাই। পর-মুহূর্তেই কিন্তু শান্তশিষ্ট

ভাব, কোন কথা নাই মুখে। ঝাঁকড়া রেশমের মত চুলের ভিতর হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বেণুকে প্রশ্ন করে, তারপর উৎপলবাবু, ফ্যাক্টরিটা কেমন চলছে বলুন !

চলছিল তো ভালই, তবে কিছুদিন হ'ল শ্রমিকদের সঙ্গে মন কষাকষি চলছে। বাবার ধারণা বীণা নাকি এর পিছনে আছে, কারণ ও মাঝে মাঝে বস্তিতে বেড়াতে যায়।

বীণাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নিবারণ। মনে হয় সে যেন তাহা বুঝিতে পারে। ইচ্ছা করিয়াই মুখ তুলে না বীণা।

শচীনও এতক্ষণ অঙ্কটা দেখিতেছিল। বেণুর কথা শুনিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠে, তাই না কি ? খুব সুখবর উৎপলবাবু। অনেক দিন পরে একটা ভাল খবর শুনলাম। কি ব্যাপার ?

উত্তর দেয় বীণা, ব্যাপার এমন কিছু নয়। জিনিসপত্তরের দর বেশি, পূজোর সময় এক মাসের বোনাস দেবার কথা হচ্ছিল, ওরা চায় দু মাসের। এ বছর রিজার্ভ ফাণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রাখা হয়েছে। সেটা কমিয়ে পঁচিশ হাজার করলেই ওরা আর এক মাসের বোনাস পেতে পারে।

তা মেয়ে যখন শ্রমিকদের পিছনে তখন নিশ্চয়ই তারা জিতবে। বাবাকে হারতেই হবে।—বউদি হাসিয়া উঠেন।

শচীন বলে, জিততেই হবে। না হ'লে আপনি অনশন করবেন বীণা দেবী।

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠে। রাণুও খিলখিল করিয়া হাসিতে থাকে।

বীণা আবার খাতার দিকে মনোযোগ দেয়। আঙুল গণিয়া বিড় বিড় করিয়া হিসাব করে। রাণুও দেখাদেখি নিবারণের আঙুলের উপর আঙুল দিয়া এক প্রকার শব্দ করে।

রাখুন দিকি ও সব এখন বীণা দেবী।—অস্থির ভাবে বউদি বলেন।

বীণা বাঁ হাতটা উঁচু করিয়া থামিতে ইঙ্গিত করে। হিসাবের এক জায়গাতে থামিয়া বলে, এই হ'ল, ধরা পড়েছে ভুল। এই, এই, এই। পেন্সিল দিয়া সে ভুলটা শুদ্ধ করিয়া দেয়।

কোথায়, কোথায় দেখি?—নিবারণ খাতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

এই তো, এইখানে। যোগে ভুল হয়েছে সামান্য।

সামান্য এই ভুলের জন্যে অঙ্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখুন। আপনার এবার জয়ের পালা।

সঙ্গে সঙ্গে বীণা উত্তর দেয়, দুঃখ এই, কারা যে হারছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। এ জয়ে আনন্দ নেই এতটুকু।

আনন্দ আপাতত না থাকলেও আশা আছে আপনার।—বউদি কথাটা শেষ করেন, মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করেন।

নিবারণ যেন লজ্জা পায়। তাহার অবস্থা দেখিয়া বউদি হাসিয়া ফেলেন। তাঁহার কথার ভিতরে যে প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে, তাহা নিবারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারে। বিজয় খাতাপত্র লইয়া চলিয়া যায়। শচীন বলিয়া উঠে, সেতারটা এনেছেন বীণা দেবী?

হ্যাঁ এনেছি, শুনবেন? চলুন আমাদের বাড়ি। ইমনের আলাপ শোনাব আপনাদের আজ। ভটচায মশাই তবলা বাজাবেন।

বউদি বলিলেন, উৎপলবাবু, আমাদের কার্যসূচীটা জানিয়ে দিন ওঁদের।

আপনিই বলুন না বউদি। বেণু তাহার পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বউদির হাতে দেয়।

আমি বলব? আচ্ছা শুনুন নিবারণবাবু।—কাগজের উপরে চোখ রাখিয়া বউদি বলিতে থাকেন, আজ সেতারের শেষে চা জলখাবার খেয়ে আমরা বেড়াতে বের হব। পাকা রাস্তা দিয়ে আমতলির বাঁক

অবধি গিয়ে ফিরব। তারপর রাত্রে আমার বাড়িতে দুটি খেতে হবে সকলকে, আর রাত এগারটা পর্যন্ত তাস খেলা। কাল সকালে মাধবপুরের তালপুকুর-ধারে আমবনের ভেতর চড়ুইভাতি। আপনাদের ডাক্তারবাবুকে হাসপাতালের কাজের শেষে অন্তত দু ঘণ্টার জন্যে ধ'রে রাখতে হবে, বীণা দেবী ভার নিয়েছেন। সন্ধ্যার পর দিদিমা গল্প বলবেন। পরশু সকালে উৎপলবাবুর গান ও বীণা দেবীর বীণা বাদন। শচীনবাবুর রবীন্দ্র-মন ও দর্শক সম্বন্ধে আলোচনা। তার পরদিন থেকে উৎপলবাবুদের বাড়িতে পূজো তিন দিন ধ'রে চলবে। আমরা সকলে ওঁদের বাড়িতে থাকব। আরতির ভার শচীনবাবু নেবেন। চণ্ডীপাঠ করবেন নিবারণবাবু। পচু ঢাক বাজাবে। বিজয়ার দিন চড়কডাঙায় মেলা দেখতে যেতে হবে। নিরঞ্জনের পর নিবারণবাবুর বক্তৃতা, বীণা দেবীর আবৃত্তি ও আলাপ, আমার মাতৃস্তুতি, উৎপলবাবুর গান। এই পর্যন্ত ঠিক আছে।—বলিয়া বউদি থামিয়া যান। শচীন বলে, আরও একটু বাকি আছে বউদি। লিখুন লক্ষ্মীপূজোর দিন নিবারণ-বাবুর বাড়িতে গানের অনুষ্ঠান, রাত্রিতে খাওয়াদাওয়া। দাদা নিজে রান্না ক'রে খাওয়াবেন সকলকে। নিবারণ বলে, শেষ হয় নি এখনও। লিখুন তার পরদিন গ্রামের অবস্থা দেখতে যেতে হবে। যারা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে তারা কেমন ভাবে বাঁচছে তা দেখে আসতে হবে। কামার কুমোর তাঁতি চাষীদের প্রত্যক্ষ পরিচয় দরকার।

নিবারণ ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। বউদি নিবারণের কথাগুলি লিখিতে থাকেন। বীণা উঠিয়া গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দেওয়ালে সংলগ্ন ম্যাডোনার ছবিটির দিকে তাকাইয়া থাকে। শেফালি ফুলগাছের কুঁড়ি সমেত একখানি ডাল জানালার নিকট ধীরে ধীরে দুলিতে থাকে।

খোলা জানালা দিয়া সবুজ মাঠের উপর হইতে ধানফুলের গন্ধভরা

দমকা হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতে থাকে। বীণার শাড়ির আঁচল উড়িয়া যায়। কয়েকগাছি চুল গালের উপর আসিয়া পড়াতে তাহাকে বড় সুন্দর দেখায়। ঘরখানি শান্ত স্নিগ্ধ ও সম্ভাবনাপূর্ণ হইয়া উঠে।

জনকপুর হইতে ফিরিবার পর সেদিন রাত্রিতে বীণা বৈষ্ণব সাহিত্যের সমালোচনা পড়িতেছিল। কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী পাশে খোলা পড়িয়া ছিল। শ্রীরাধার প্রেম সম্বন্ধে সমালোচক বলিতেছেন—ভক্ত ও ভগবান, সৃষ্টি ও তাহার কারণ।

কর্মের সহিত কর্তার যেরূপ সম্বন্ধ, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্তার সেইরূপ সম্বন্ধ। কারণ সৃষ্টিকর্তা যাহা করিয়াছেন, যাঁহাতে স্থূলভাবে সৃষ্টি সূক্ষ্মভাবে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই তাঁহার কর্ম। অতএব তাঁহার সৃষ্টিই তাঁহার অনন্ত মনের অংশ, সুতরাং তিনি স্বয়ং। তাঁহাকে স্বীকার করিলে তিনি আছেন। অস্বীকার করিলে তিনি নাই। কিন্তু স্বীকার করিবার পথ আছে কি ? আছে।

তিনি যখন দেহকে আশ্রয় করেন, সীমার ভিতর প্রকট হইয়া উঠেন তখন তিনি পার্থিব নিয়মের—প্রকৃতির অধীন হইয়া পড়েন। ধ্বংস ও পরিবর্তনের রূপ, ব্যাধি জরা মৃত্যুর দুঃসহ যন্ত্রণা দেহীর ভিতর মুক্তির কামনা আনিয়া দেয়। সে ফিরিয়া যাইতে চায়, বিচ্ছেদে তাহার মন কাতর হইয়া উঠে, কাহাকে যেন সে শতরূপে স্বীকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, কাহার বিরহ অহর্নিশ তাহাকে পীড়া দেয়। এমন অবস্থায় ভক্তের নবজীবন লাভ হয়।

সুতরাং ঈশ্বরপ্রেম ভক্ত ও ভগবানকে লইয়া। শ্রীরাধা ভক্তমনের সেই আকুলতার দ্যোতক। সৃষ্টির অন্তরের সেই চিরবিরহরূপ শ্রীরাধার লীলার ভিতর ধরা পড়িয়া আছে। মুক্তিকামী বৈষ্ণবগণ ও বৈষ্ণব কবিগণ মনুষ্যসুলভ চিত্তবৃত্তিপ্রসূত বহু উচ্চতর ভাবকে আশ্রয় করিয়া

তাঁহাদের সেই আকুলতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মধুর ভাব তাহাদের অন্যতম।

বই পড়িতে পড়িতে বীণা কখন যে জনকপুরের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করে তাহা সে বুঝিতে পারে না। দিদিমা ও গৌরীকে লইয়া কিছুক্ষণ মনের ভিতর নাড়াচাড়া করিবার পর সে নিবারণবাবুতে আসিয়া থামিয়া যায়। বেশ লোকটি, না? অনেক সে পড়িয়াছে, শুনিয়াছে ও দেখিয়াছে—এমন অদ্ভুত লোকের সংস্পর্শে সে তো কখনও আসে নাই। তাহার কল্পনার সঙ্গে কতই না মিলিয়া যায়। না, চমৎকার স্বভাব লোকটির।

অনেক দিন দাদুর কাছে আসেন নাই তিনি, কবে যে আসিবেন কে জানে! হঠাৎ বীণার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়া যায়। নিজের দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে সে যেন চমকিয়া উঠে, মুখখানি করুণ করিয়া মোমবাতিটি নিবাইয়া দিয়া সে শুইয়া পড়ে। ও-পাশের খাটে দাদু তখন ঘুমাইতেছিলেন।

সেদিন অধিক রাত্রিতে শশধর ফ্যাক্টরী হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিলে স্নেহলতা বলেন—তোমার জনকপুরের হাসপাতালের ডাক্তার শরৎ হালদার আছেন না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কি হয়েছে?

তাঁর স্ত্রী গৌরী একখানা চিঠি লিখেছেন।

কি লিখেছেন? সব ভাল আছেন তো?—পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে বলেন শশধর।

হ্যাঁ, আছেন।—একটু থামিয়া সঙ্কোচ ও দ্বিধার সহিত স্নেহলতা বলেন, বীণার বিয়ের একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তিনি।

তাই নাকি? কার সঙ্গে?—ঈষৎ হাসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করেন শশধর।

নিবারণবাবুর সঙ্গে। লিখেছেন এ বিয়েতে দুজনেই সুখী হবে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া স্নেহলতা চুপ করিয়া থাকেন। শশধরের মুখ নিমেষের মধ্যে গম্ভীর হইয়া উঠে। একটু বিরক্তভাবে বলেন, কি ক'রে বুঝলেন তিনি ?

তা আমিই বা কি ক'রে জানব বল ? এখানে যখন এসেছিলেন তখন হয়তো বা কিছু লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। তাই ফিরে গিয়েই চিঠি লিখেছেন।

বীণা দেবী আছেন বাড়িতে, বীণা দেবী ?—গৌরী জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ, আছে। আরে, এ যে বউদি! পিছন ফিরিয়া গৌরীকে দেখিয়া বেণু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। কাছে আগাইয়া আসে। বলে, তারপর বউদি কোথা থেকে ? চলুন, চলুন। ভারি মজা তো।

বড়দা, তুমি ব'স এখানে। গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কি হবে ? রাণু, তুই মামার কাছে থাক্।

বেণু আপত্তি করিয়া বলে, না না, উনি নীচে বসবেন কেন ? উনিও ওপরে চলুন না। সকলে উপরে উঠিতে থাকে। উঠিতে উঠিতে গৌরী বলেন, বড়দা আজ ক'দিন হ'ল পাকিস্তান থেকে এসেছে, এসেই জনকপুরে আমাকে দেখতে গিয়েছিল। চ'লে এলাম দুদিনের জন্যে। বউদিরাও পৌঁছেছে, দেখি নি তো অনেকদিন।

দোতলায় পৌঁছিয়া বেণু ডাকে, বীণা—বীণা, দেখ, কে এসেছে!

বীণা এক প্রকার দৌড়াইয়াই তেতলার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসে। সহাস্যে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বউদির হাত দুইটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলে, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম বউদি, আপনি নিশ্চয়ই একবার আসবেন এখানে।

বউদি হাসিয়া বলেন, তা তো হ'ল, কিন্তু শেষের চিঠিখানার উত্তরটা পেলাম না কেন ভাই ?

বেণু বড়দাকে লইয়া বসিবার ঘরে চলিয়া যায়। সুইচ টিপিয়া আলো

জ্বালাইয়া ফ্যানটা খুলিয়া দেয়। বড়দার দিকে তাকাইয়া বলে, বসুন, এই আসছি। সে অবিনাশকে খবর দিবার জন্য তেতলায় উঠিয়া যায়।

বউদির প্রশ্নে বীণা মুখ নীচু করিয়া থাকে। কোন কথা বলে না। বউদি বলেন, এতে লজ্জার কি আছে ভাই! তুমিই আগ্রহ দেখিয়েছ ব'লে আজ এসেছি।

আগ্রহ দেখানো এক, আর অগ্রসর হওয়া আর এক কথা।—বীণা মুখ না তুলিয়াই কথাগুলি বলে।

এগিয়ে যাওয়া যাক না কেন, দোষ কি তাতে? না হয় না হবে।

মনটা ভারি বিশ্রী রকমের খারাপ হয়ে আছে, বউদি। কি যে করি! সব সময় ভয় হয়।

থুতনীতে হাত দিয়া বীণার চোখে চোখ রাখিয়া বউদি হাসিয়া বলেন, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে নিজের ওপরই তো সব নির্ভর করে।

বীণা হাসিয়া উত্তর দেয়, জানাজানি হয়ে গেলে বড় লজ্জা পাব কিন্তু।

শশধর চিঠিটির প্রতি কোন আগ্রহ না দেখাইয়া প্রশ্ন করেন, আর কি লিখেছেন?

লিখেছেন, মানুষ হিসেবে পরিচয় দেবার মত সমস্ত গুণই আছে নিবারণবাবুর। এই প'ড়ে দেখ।

স্নেহলতা চিঠিখানা শশধরের হাতে দেন। শশধর একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া চিঠিখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করেন, বীণা জানে?

স্নেহলতা ক্ষুণ্ণভাবে বলেন, এতে রাগ করবার কি আছে? মেয়ে থাকলে অমন সম্বন্ধ এসেই থাকে। পছন্দ না হয়—

পছন্দ-অপছন্দের কোন কথাই উঠতে পারে না। বীণা জানে কি না, তাই বল।

জানে বীণা।

কি বললে শুনে ?

শুনে খুব লজ্জা পেয়েছে মনে হ'ল।

তা তো পাবার কথাই। সে হয়তো ধারণাই করতে পারে নি। কিছু বলেছে ?

না, তা ঠিক না। কেন না, শোনবার পরে বাবার কাছে গিয়ে নিবারণবাবুর সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করেছে।

তাই না কি! ডাক্তার-গিন্নীর কাছ থেকে যা সব শুনে এসেছে সেই সব আর কি। বাবাকে বলেছ ?

হ্যাঁ, জানিয়েছি। শুনে হেসে বললেন, বেশ তো, দাও না দিয়ে, ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগে। উপযুক্ত ছেলে।

শশধর উত্তেজিত হইয়া পড়েন। চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বলেন, হয়েছে হয়েছে, থাম এবার। বাবার আর কি—এ সব কথা খবরদার আর ব'লো না আমার কাছে। লিখে দাও, আমাদের সঙ্গে ওদের খাপ খাবে না। যত সব—

তাই হবে, তাই হবে। নাও, ওঠ এখন। হাতে মুখে জল দিয়ে এস, খেতে দিই তোমাকে।

তারপর একদিন।

অবিনাশ প্রায় এক বৎসর হইল জনকপুর হইতে চলিয়া গিয়াছেন। অবিনাশ মজুমদারকে সূত্র ধরিয়া নিবারণ ও বউদির ভিতর যে পরিচয় হইয়াছিল, যাতায়াতে তাহা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বিকালের দিকে নিবারণ প্রায়ই ডাক্তারবাবুর বাসায় বেড়াইতে যায়, সেদিনও গিয়াছিল। নিবারণের মন ভাল ছিল না। ইদানীং তাহার মাঝে মাঝে এমন হইত।

বউদি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নিবারণ একা বসিয়া একখানি মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিল। হঠাৎ পত্রিকাটির ভিতর হইতে একটি চিঠি বাহির হইয়া পড়ে। হস্তাক্ষর যেন পরিচিত, না? লেখাটি যেন শশধরের মনে হয়। একই রকম লেখা, সেই যে দাদুকে তিনি ত্রিশ একত্রিশ বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন। বউদিকে তিনি চিঠিপত্র লিখেন না কি? চিঠিখানা রাখিয়া দিতে দিতেই কয়েকটি লাইন তাহার চোখে পড়িয়া যায়—"অঙ্গহানির কথা আমরা তুলব না, সে ইতিহাস আমরা জানি। আর কিছু না কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি তো সকলের মধ্যেই আছে। নিবারণবাবু অনুপযুক্ত—এ কথা কেউ বলবে না, আমরাও বলছি না। তবুও আচার ব্যবহার সমাজ রুচি সব দিক থেকে বিচার বিবেচনা ক'রে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজী হ'তে পারলাম না। আমাদের ক্ষমা করবেন—"

রাণুর জন্য দুধের ফিডারটা হাতে করিয়া বউদি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নিবারণ নাই। পত্রিকার উপরে চিঠিখানি পড়িয়া ছিল। নজরে পড়িতেই তাঁহার যেন মাথা ঘুরিয়া গেল। কি সর্বনাশ! এত করিয়াও এক মুহূর্তের অসাবধানতায় তাঁহার সমস্ত গোপন চেষ্টা প্রকাশ হইয়া পড়িল! নিদারুণ অনুশোচনায় তাঁহার মন ভরিয়া গেল, চোখে জল আসিয়া পড়িল। পত্রখানি তাঁহাকে যেন বিদ্রূপ করিতে থাকে।

রাত্রিতে ডাক্তারবাবু বাসায় ফিরিয়া দেখেন, বউদি মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছেন। মনে মনে বিরক্ত হন ডাক্তারবাবু, জিজ্ঞাসা করেন, কি হ'ল গৌরী? শরীর খারাপ না কি?

না।—বউদি না উঠিয়া উত্তর দেন।

তবে?

তবে আর কি? শুয়ে আছি।

শুয়ে আছ? মুখের ভাব অমন কেন?

কি হয়েছে মুখে?

কেমন যেন মনমরা মনমরা ভাব।

বউদি বিরক্ত হইয়া উত্তর দেন, সে সবে তোমার দরকার কি? মন কি মানুষের খারাপ হয় না কখনও?

বাঁকা বাঁকা কথা বলছ কেন? জিজ্ঞাসা করাতে দোষ হয়ে গেল? আজকাল তোমার স্বভাব এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? ডাক্তারবাবুর কথার ভিতর উষ্মার ভাব প্রকাশ পায়।

না, আমার স্বভাব এমন হচ্ছে না, তোমারই হচ্ছে। চিন্তা ক'রে দেখ, যত্ত সব ছোটখাট জিনিসের দিকে তোমার নজর।—বউদি উঠিয়া বসেন।

ডাক্তারবাবু চটিয়া যান, মুখ ঘুরাইয়া বলেন, কি বললে? তারপর গম্ভীর ভাবে বলেন, তোমার এ খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে গৌরী।

বউদি খাট হইতে নামিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলেন, কি রকম, কি রকম, বাড়াবাড়িটা কিসের শুনি? ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে বোধ হয়?

বলব না বলব না মনে করেছিলাম, তুমি আমাকে বলালে। আজ আমাকে বলতে হ'ল।—ডাক্তারের কথায় উত্তেজনা প্রকাশ পায়।

বল না। আমি কি তোমার বলাতে ভয় পাই না কি?

নিবারণবাবু এসেছিলেন আজ?

হ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে? দোষ হয়েছে না কি?

বউদি দেখেন, কথায় কথায় বিবাদ বাড়িয়া উঠিতেছে। তিনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া উপহাসের সুরে সহজ ভাবে বলেন, এতদিন তো কোন দোষ হয় নি, আজ হ'ল কেন? মাথা তোমার ঠিক নেই আজ, আজ খেলাতে হেরেছ নিশ্চয়।

হাসি চাপিয়া ডাক্তার বলেন, না না গৌরী, এতটা বেশি মেলামেশা করা ঠিক হচ্ছে না। আমাকে এর জন্যে কত কথা শুনতে হচ্ছে জান? ঠাট্টার চোটে অস্থির হয়ে উঠলাম যে!

মুখখানি কঠিন করিয়া ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া বউদি বলেন, ঠাট্টা! কে করেছে ঠাট্টা তোমাকে?

কেন, দৃষ্টিকটু হ'লে সবাই বলতে পারে। বাড়াবাড়ি হ'লে বলবে না?—ডাক্তারবাবুর রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল, বলেন, একটু তো বুঝে-সুঝে চলতে হয়।

কে বলেছে বল না?—জিদ ধরেন গৌরী।

শুনে কি লাভ? আমাকে জিজ্ঞাসা করে তারা—নিবারণবাবু কি অসুখে ভুগছেন ডাক্তারবাবু? আপনিই তো দেখছেন শুনছেন, আমরা জিজ্ঞাসা ক'রে তো জবাব পাই না। আপনার এখানেই তো ওঠা-বসা বেশি। সারাদিন নানা জনের নানা রকম প্রশ্ন।

বেশ, পছন্দ না হয় নিবারণবাবুকে 'না' ক'রে দিও।—বউদির মুখ করুণ হইয়া উঠে। কথা বলিতে গিয়া ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া যায়।

আমি কি না-করার কথা বলছি না কি? আমি বলছি—একটু সাবধানে চলতে, যাতে নিন্দে না হয়।

নাও নাও, আর গোপন ক'রো না তুমি। তোমারও যথেষ্ট আপত্তি আছে। সকলের নাম ক'রে তুমিও আজ অপমান করলে।—বউদির চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। তিনি বারান্দায় বাহির হইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়েন। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকেন।

ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিয়া হতভম্বের মত কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বলেন, কি করছ গৌরী? ছিঃ! এমন কি বলেছি আমি?

তুমি এখান থেকে স'রে যাও। বিরক্ত ক'রো না আমাকে। আমি

একা থাকব। অস্ফুট স্বরে বলেন, নিবারণবাবু এলে, তাকে আমি কাল এমন অপমান করব!

এ কি পাগলামি আরম্ভ হ'ল তোমার?

পাগলামি আমার, না, তোমাদের শুনি? তোমাদের শিক্ষার কি মূল্য আছে? স্বামী আত্মীয় ছাড়া অপর কোন পুরুষের সঙ্গে তোমরা কোন সম্বন্ধ কল্পনা করতে পার না। সমাজে যেটুকু চলছে সেটুক মনের ভেতর অবিশ্বাস নিয়ে বাইরে দেখানো সম্বন্ধ। ডুববে তোমাদের সমাজ, ডুববে। ব্যভিচার তো সেই জন্যেই বেড়ে উঠছে।

ডাক্তারবাবু গৌরীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া বলেন, থাম থাম গৌরী। চল, আমার বিশ্বাস আছে, আমাকে ইতর মনে করলে কষ্ট পাবে। চল, ওঠ, এখন অনেক রাত হয়েছে খেতে দেবে আমাকে। তোমার যা ভাল মনে হয় ক'রো, কোনদিন আর কিছু বলব না তোমাকে।

গৌরী উঠিতে উঠিতে বলেন—মাস্টাররা বলেছে, না? এমন সব সুন্দর মনের শিক্ষাই তো ছেলেরা পায়। তিনি রাগে গরগর করিতে করিতে ঘরের ভিতর চলিয়া যান।

পরের দিন পিসীমার নিকট হইতে বউদি সংবাদ পান, নিবারণ ভোরের ট্রেনে বৈদ্যনাথধামে বেড়াইতে গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, তিন চারি দিন পরে সে ফিরিয়া আসিবে।

আরও কয়েকদিন পরে সেদিন নবম শ্রেণীতে নিবারণ প্রবন্ধ-রচনা শিক্ষা দিতেছিল। বিষয়—সংযম। বিষয়টি কেন যেন বড় ভাল লাগে নিবারণের, ভাবে—হাঁ, সংযমই তো সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা, ইহারই অভাবে সৃষ্টি মূল্যহীন হইয়া পড়ে। সবই আছে, ইহাই নাই; সুতরাং ইহাকেই সাধনা করিয়া লাভ করিতে হয়।

আগ্রহের সহিত প্রত্যেকের খাতাগুলি দেখিয়া নিবারণ বলে—হ্যাঁ,

মোটামুটি একরকম সকলেরই হয়েছে, ভালই হয়েছে। উপসংহারে আমি কিছু ব'লে দিচ্ছি, লিখে নাও সকলে।

"নদীর জল বন্যারূপে মানুষের দুঃখের কারণ হয়, কিন্তু জলধারাকে বাঁধ দ্বারা প্রতিহত করিয়া, কূলকে প্লাবিত করিতে না দিয়া যদি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত উপায়ে তাহাকে অনুর্বর এবং জলহীন শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত করিতে পারা যায় তবে সেই জলরাশি মানুষের শস্যসম্পদ বৃদ্ধি করে, মানুষের অশেষ সুখের কারণ হয়। সেইরূপ চিত্তবৃত্তিকে, রিপুকে অসংযত স্বেচ্ছাচারিতার পথে ছাড়িয়া দিলে তাহার জন্য যে কেবল ব্যক্তিবিশেষরই দুঃখভোগ ঘটে তাহা নহে, সমাজের ভাগ্যেও অবর্ণনীয় দুঃখভোগ ঘটিয়া থাকে। অপর পক্ষে ইহাদিগকে নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও একাগ্রতার দ্বারা সংযত করিয়া জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করিলে অসীম আনন্দ ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, সমাজের সুখ বৃদ্ধি হয়। সংযম চিত্তবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করে, শক্তির অপচয়কে নিবারণ করে। অপচয় নিবারিত হইলে পৃথিবী অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠে।"

ঘণ্টা পড়িয়া যায়। নিবারণ জিজ্ঞাসা ক'রে—কি, সকলেই লিখেছ তো? বেশ। বাড়িতে গিয়ে বার বার ক'রে প'ড়ে বুঝবার চেষ্টা করবে, কেমন?

অফিসের দিকে যাইতে যাইতে নিবারণ ভাবে, বড়ই সুন্দর ছিল রচনার বিষয়টি। অনেক কথা বলা চলিত, কিন্তু মুস্কিল, বলিলে উহারা কিছুই বুঝিত না।

আপনাকে এভাবে দেখতে আমাদের যে কত কষ্ট হয় তা কি আপনি বুঝতে পারেন না নিবারণবাবু?—কথা বলিতে বলিতে বউদির চোখ সজল হইয়া উঠে।

কেন, খারাপটা কি আছি বলুন? বেশ তো আছি।

বেশ তো আছেন! একে বেশ থাকা বলে না। পাগলামি আর কতদিন করবেন বলুন? এবারে আবার তীর্থ করতে আরম্ভ ক'রে দিলেন রীতিমত।

আমাকে কি করতে বলেন, তবে? বলবেন হয়তো—বিয়ে করুন, সংসার করুন। দলভারী করতে চান আর কি?

দেখুন আমি বুঝি সব, আমাকে ফাঁকি দেবেন না। মুখ ফুটে তাও বলবেন না আপনি, স্বীকার করবেন না কিছুতেই। কেবল হেঁয়ালী আর আদর্শের দোহাই।

নিবারণ ব্যথা পায় মনে, বলে—বউদি, কেন শুনি, কি শত্রুতা আপনার সঙ্গে আছে আমার যে বারে বারে একজনের কথাই আপনি আমাকে মনে করিয়ে দেন? ভুল ক'রে আমাকে দলে টানবার চেষ্টা কেন করেন আপনি? লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রেম প্রীতি দিয়ে আমি নিজেকে ঢেকে রাখব, একজনের প্রেম দিয়ে নয়। আমি তাই কাজ চাই। কাজ করি সেবার কাজ—যত্ন-আত্মীয়তার কাজ।

নিবারণ যেন কেমন হইয়া যায়, করুণভাবে বউদির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে সে। বউদি হাসিয়া বলেন—আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না, আর বলব না, থামুন তো আপনি।

কেন, শুনতে ভাল লাগে না বোধ হয়?

না, তা কেন? বড় কষ্ট হয় আমার। আপনার একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।

না থাকুক। শুনুন এবার, বৈদ্যনাথধামে গিয়ে আমার যা মনে হয়েছিল। বড় বলতে ইচ্ছা করে।

বলুন, শুনি।

মনে হ'ল, আজ অবধি যত ভক্ত গিয়েছে সেখানে সব জড়ো হ'য়ে

আছে, কেউ ফিরে যায় নি ঘরে। প্রতি মুহূর্তে ভক্তের দল বেড়ে যাচ্ছে। অগণিত মানুষের সমুদ্র। আমি তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি; আমার চোখের সামনেই সব হচ্ছে। তারপর কি হ'ল জানেন?

কি?

তারপর যেন মনে হ'ল, আমি বিরাট হয়ে গেছি, মন্দিরের চূড়ো ভেদ ক'রে আমার মাথা নক্ষত্র নীহারিকার মধ্যে মিশে গিয়েছে। আমি দেবতার সঙ্গে মিশে গিয়েছি। সেই কোটি কোটি মানুষ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে ব'লে যাচ্ছে, আমাদের পথ দেখাও—মুক্তির পথ দেখাও তুমি, শান্তি দাও, দয়া কর, দয়া কর তুমি। কি করুণ তাদের সেই বিলাপ! কি করুণ! আমি যেন তাদের সেই ডাকে সাড়া দেবার চেষ্টা ক'রেও পারছি না।

বউদি আঁচল দিয়া মুখ ঢাকেন। রাণু অবাক হইয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া থাকে।

নিবারণ তখন অভিভূতের মত বলিয়া চলে—তারপর বউদি, তারপর যেন মনে হ'ল, আমার আকৃতি ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে। আমার মাথা সমস্ত ভক্তের পায়ের কাছে নেমে এল। বিরাট এই সৃষ্টির কাছে আমার অস্তিত্বকে নগণ্য ব'লে মনে হ'ল। মনে হতে লাগল, এই তো আমি বেঁচে আছি তোমাদের দয়ায়, তোমাদের দানে। প্রতিটি ধূলিকণার কাছে আমি তো ঋণী। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চীৎকার ক'রে বলবার চেষ্টা করলাম, তোমাদের এই ঋণ আমি শোধ করব, তোমাদের সেবা করব আমি, তা যেন পারলাম না।

হাসিয়া বউদির মুখের দিকে তাকাইয়া বলে—বাঁচা বাঁচা করছেন, জীবনটা যতখানি বাঁচবার ততখানি না-বাঁচবার যে সে কথা ভুলে গিয়েই না যত গণ্ডগোল ক'রে বসি!

বউদি প্রকৃতিস্থ হন, মনে মনে ভাবেন, এই ফুল কি সকলের অজ্ঞাতে অনাদৃত ও উপেক্ষিত থাকিয়া অলক্ষ্যেই ঝরিয়া যাইবে?

নিবারণ হাসে। বলে—কেমন পাগলের মত ব'লে চলেছি না বউদি? ঠিকই বলেছেন, মাথাটা একদম খারাপ হ'য়ে গেছে।

হা-হা করিয়া নিবারণ হাসিয়া উঠে। হাসি থামিলে বলে, সব ঠিক ক'রে ফেলেছি আমি, সব ঠিক ক'রে ফেলেছি।

কি? কি ঠিক ক'রে ফেলেছেন?—ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন বউদি।

নির্বাচনের কাজে লেগে যাব এবার থেকে—ভারতের সাধারণ নির্বাচন।

তাও ভাল, বাঁচলাম বাবা।—বউদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। মনে মনে চিন্তা করেন, ভালই, কাজের ভিতর থাকিলে হয়তো কয়েকদিন ভুলিয়া থাকিবে।

কেন? আপনি কি মনে করেছিলেন?

কিছু না। তবে যে দল আপনাকে পাবে সে দল নিশ্চয়ই জিতে যাবে।

আর আমি যে দলে থাকব? প্রশ্ন করিতে করিতে শচীন ঘরের ভিতর প্রবেশ করে।—আর আমি যে দলে যাব, সে দলের কি হবে, বউদি? বউদি, আমি ঠিক করেছি দাদার বিরুদ্ধ দলে আমি যোগ দেব।

তার মানে?—বউদি যেন আশ্চর্য হইয়া যান।

তার মানে দাদাও জানে সে কোন্ দলে থাকবে আর আমিও জানি আমি কোন্ দলে যাব। এবার ভাইয়ে ভাইয়ে দেখবেন লড়াইটা কেমন চলে। শচীন হাসিয়া উঠে। বউদির নিকট কেন যেন সেই হাসি কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়।

গঙ্গাধর দত্তের বড় মেয়ে শিপ্রা জনকপুর আসে। শ্রীরামপুর

কলেজে বি. এ. পড়ে, থাকে বড় মামার কাছে। আসন্ন নির্বাচনে কোন দলের পক্ষ হইতে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য সে আসে এখানে। নিবারণ ও শচীনের সহিত ইতিমধ্যেই তাহার আলাপ পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। সেদিন নিবারণ শিপ্রাকে চা খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করে, ডাক্তারবাবু ও বউদিও উপস্থিত ছিলেন। চা পান শেষ করিয়া তাহারা জীবনের রূপ, বিকাশ ও জীবনযাপন প্রণালী লইয়া আলোচনায় মাতিয়া উঠে। কি একখানি বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শিপ্রা বলে—না নিবারণবাবু, আপনার এ মতকে আমরা মেনে নিতে পারলাম না। সমস্ত পৃথিবীটা আজ প্রত্যেক মানুষের ঘরের কাছে এসে যাচ্ছে, দূরত্ব ব'লে কোন পদার্থই থাকছে না। ভাব, মত, চিন্তার আদান-প্রদান চলছে জাতিতে জাতিতে। তাতে যদি একটা বিশেষ ছাঁচে জীবনটা ঢালাই হ'য়ে যায় তা হ'লে দোষ কি, বলুন? উন্নততর জীবনাদর্শের পটভূমিকায় সমস্ত জিনিষের বিচার ক'রে দেখুন একবার।

হাত তুলিয়া বাধা দিয়া নিবারণ বলে—থাক্। আমি বললে আমাকে গালাগালি করবেন। বলবেন, গোঁড়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি কৃপণ ও সঙ্কীর্ণ। আমার আপত্তি তো ওইখানেই। যারা মনে করছে তাদের বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও জীবনদর্শনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ও সংঘাতমুক্ত করবার জন্যে অন্য সব ধারাগুলিকে যারা প্রভাবান্বিত ক'রে কুক্ষিগত করবে তারাই ভুল করছে।

শচীন যেন কথাগুলি বুঝিতে পারে না। সে প্রতিবাদ করিয়া বলে—কুক্ষিগত করার প্রশ্ন কেন তুলছ তুমি? সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বিচারশীল মানুষের মন ভাল মন্দ বিচার ক'রে নেবে, বলিষ্ঠ চিন্তা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে সে তার ধর্ম ব'লে মেনে নেবে।

নিবারণ হাসিয়া উত্তর দেয়—মানুষের উপর ততটা বিশ্বাস এখনও আমার হয় নি। বোধ করি তোমাদেরও নয়। এখনও বুঝলে শচীন,

মৃদু চাপের ব্যবস্থাটা ঠিকই রয়েছে। যাক, আমার কথা হচ্ছে বাইরের চটকে ভুলিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে লাভ কি, বল? আমি মনে করি তোমাদের এই গতির যুগের এই যন্ত্রের যুগের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েও মানুষ তার নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনের বিশিষ্ট আকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

শিপ্রা উঠিয়া দাঁড়ায়। বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলে—ও বুঝেছি, বুঝেছি। চেয়ার টেবিলে ব'সে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা, ইলেকটি কের যজ্ঞকুণ্ডে ঘিয়ের আহুতি দেওয়া, এই সব তো? এ যে কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত ব্যবস্থা! কি বলেন, শচীনবাবু?

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে, আলোচনা ভাঙিয়া যায়। নিবারণ চেয়ার ছাড়িয়া সোজা দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে বলে—যে দিন আপনাদের সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ, কেতাদুরস্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রাচুর্যে পুষ্ট সমাজের মধ্যে চোর জোচ্চোর লম্পট খুনী থাকবে না, সেই দিন বড়াই ক'রে বলতে আসবেন শিপ্রা দেবী, তার আগে নয়। সেদিন আমার মত অর্বাচীন লোকেরাই আপনাদের মত ও পথকে সকলের আগে আনন্দের সঙ্গে মেনে নেবে।

বউদি নিবারণকে থামতে ইঙ্গিত করেন। শিপ্রা চলিয়া যায়। শচীন তাহাকে মজুমদার-বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে যায়।

যাইতে যাইতে শচীন বলে, আপনি কিছু মনে করবেন না শিপ্রা দেবী। দাদা সব জিনিসই অতীতের সঙ্গে যাচাই ক'রে দেখতে চান। আর নিজে যা বুঝবেন স্পষ্ট ভাষায় তা—

যত দোষ তো ওঁর ওইখানে। আসা অবধি লক্ষ্য ক'রে দেখছি। ক্ষুব্ধভাবে শিপ্রা বলে, নিজে যা বুঝবেন তার ওপরে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। বর্তমান যখন আছে তখন অতীত তো একটা ছিলই ছিল। তা নিয়ে অত টানাটানি ক'রে লাভ কি?

ধারাটা বজায় রাখতে চান। বিস্তর ভয় আছে মনে, নূতন ক'রে নূতন জায়গা থেকে আরম্ভ করতে গিয়ে যদি গুলিয়ে যায় সব?

শচীনের হাসিতে শিপ্রার মন যেন নরম হয়। সে বলে, কাপুরুষের মত আর কি। আমার ভাল লাগে না। কিন্তু শচীনবাবু, আপনার কথাবার্তার ভেতরেও কিন্তু দাদার মত সুর মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়, বুঝলেন?

তা যায়। অন্তত বছরখানেক আগে আরও খানিকটা বেশি ছিল। তবে দাদাকে আমি কোনদিনই বিশ্বাস করি নি। শ্রদ্ধা পেয়েছেন প্রচুর, কিন্তু প্রতিষ্ঠা পান নি একরত্তি।

তাহারা মজুমদার-বাড়িতে পৌঁছাইয়া যায়। শচীন বলে, আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে।

সকালে এসে চা খাবেন এখানে। তারপর প্রচার-অফিস হয়ে দুজনে নলখোলার দিকে বেরিয়ে যাব, কেমন? ওদিকের ভোটারদের এ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় নি।

বেশ, তাই হবে।—শচীন সম্মতি জানায়।

শচীন আজও তর্ক করিতেছিল। সে উত্তেজিতভাবে বলে, স্বীকার করলাম তোমার আমার লক্ষ্য এক। কিন্তু কর্মপন্থা বিভিন্ন। মনে রাখতে হবে সময় একটা বিশেষ ফ্যাক্টার। কাজ করলেই চলবে না, অল্প সময়ের মধ্যে করতে হবে কাজ। আর তা হবে বেশির ভাগ মানুষের কল্যাণের জন্যে।

শিপ্রা বলিয়া উঠে, হ্যাঁ ঠিক, ঠিক বলেছেন আপনি। আমরা অফুরন্ত কাল ধ'রে অপেক্ষা করতে পারব না। কবে একটি একটি ক'রে লোক সম্পূর্ণতা পেয়ে সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠবে—আমরা আশা নিয়ে

তার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে ব'সে থাকব যুগ যুগ ধ'রে তা হতেই পারে না। মানুষ যে ততদিন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে।

হাঁ্যা, আর সেই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে যদি আমাদের এই সমাজদেহের পীড়াদায়ক দুষ্ট ক্ষতগুলিকে কেটে বাদ দিতে হয়, তা হ'লে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্যে তাও করতে দ্বিধা করব না আমরা।—টেবিলের উপর জোরে একটা চাপ দিয়া কথাগুলি বলে শচীন।

ক্ষত ছাড়া দেহকে কল্পনা করতে পার তুমি? বিষ ছাড়া অমৃতকে পার? যদি বল—পার, বলব—মিছে কথা বলছ তোমরা। আমাদের কাজ হবে ব্যাধিগ্রস্ত অংশকে ব্যাধিমুক্ত ক'রে তা আমাদের প্রয়োজনে লাগানো। সেইখানেই সৃষ্টির চরম সার্থকতা।—প্রত্যুত্তরে বলে নিবারণ।

শিপ্রা বাধা দিয়া বলে—না না, তা হতে পারে না। অমঙ্গলের সঙ্গে, দুষ্টের সঙ্গে, শয়তানের সঙ্গে কিছুতেই মিতালি হ'তে পারে না। সমাজে তাদের স্থান নেই। যারা ওদের ভাল করতে যাবে তারা নিজেরা তো দূষিত হবেই, সমস্ত সমাজকেই ওরা দূষিত ক'রে ফেলবে। ওদের নিশ্বাস পর্যন্ত বিষাক্ত, ওদের টুঁটি চেপে মেরে ফেলতে হবে।

বন্ধুত্ব করতে হবে না পাপের সঙ্গে, সে কথা আমি মানি। কিন্তু মানুষের কি দোষ? কে এত পাপ দিয়ে তাদের পাঠিয়েছে বল? কে? এই সমাজ না? তারা তো আর বাইরে থেকে আসে নি। তবে সমাজ তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করে কি ক'রে, আমি বুঝতে পারি না। ভ্রান্ত তোমরা, তোমরা ভুল বুঝেছ।

শচীন রাগিয়া যায়, বলে, তুমি ভুল বুঝেছ, আমরা ভুল বুঝি নি। তুমি ভুল বুঝেছ আর আমাদের ভুল বোঝাচ্ছ। তুমি প্রগতি-বিরোধী, তুমি সমাজের শত্রু। তাহার কথার ভিতর রূঢ়তা প্রকাশ পায়।

আমি সমাজের শত্রু? আশ্চর্য! কি ক'রে বললে এ কথা?

ঈষৎ হাসির সহিত নিবারণ বলে, আমি বলছি ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে, অপরাধপ্রবণ মানুষকে, বৈষম্যের সমর্থনকারীদের খুঁজে বের কর, তাদের পৃথক ক'রে ফেল সমাজ থেকে। তার পর স্নেহ দিয়ে, দয়া দিয়ে, মায়া মমতা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে তাদের পরিবর্তন ক'রে নাও সমাজের উপযোগী ক'রে। সবটা না পারলেও কিছুটা তো পারবে। আর সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা কর সেই সব ব্যাধির কারণ খুঁজে বের ক'রে সমাজ থেকে সেগুলিকে দূর ক'রে দিতে। হ্যাঁ, তবেই হবে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, আর সভ্যতাও মুক্তি পেতে পারবে। বিশিষ্ট অর্থও তার বজায় থাকবে তা হ'লে।

কিছু না, কিছু না, তোমার এ নিছক আদর্শবাদ। ব্যাবহারিক জগতে এই সব দিবাস্বপ্নের কোন স্থান নেই। তুমি শুধু কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চাও; আর চাও ভেতরে ভেতরে প্রতিক্রিয়াশীলদের সুবিধা ক'রে দিতে।—উত্তেজিতভাবে বলে শচীন।

শচীন, শচীন!—নিবারণ গম্ভীরভাবে ডাকে শচীনকে। সে ডাকে যেন স্নেহ ও বিশ্বাসের দাবী আর আদেশের সুর মিশানো থাকে।

শচীন, কেন মিছিমিছি এই তর্কগুলো করছ তুমি? বড় অন্যায় হচ্ছে তোমার। হত্যাকারী পাপীকে, সমাজবিরোধীকে হত্যা করলে বটে, কিন্তু তুমি কি বলতে চাও তার সেই মন হত্যার স্পর্শ থেকে অব্যাহতি পেল? পাপ কি নূতন রূপে, নূতন পথে সমাজে ঢুকল না?

ঢুকুক। তাতে সমাজের ক্ষতি হবে কম।—শিপ্রা বলিয়া উঠে।

নিবারণও যেন নিজেকে সংবরণ করিতে পারে না। সে উত্তেজিত ভাবে উত্তর দেয়, তা হ'লে সমস্যার সমাধান হ'ল কি ক'রে? পাপের বীজ কোথায়? মনে না? মানুষের সেই মনকে কি তোমরা ভয় দেখিয়ে শাসন করতে চাও?

দুইজনে একরকম চীৎকার করিয়া উঠে, না, তা নয়। আমরা এমন শাসন-ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে চাই, যাতে মানুষ-নামধারী কতকগুলি পশু

মানুষের এই সমাজের রীতিনীতিগুলোকে ভাঙতে ভয় পায়। সে পশুর দল ধরা পড়ে সহজেই আর সমুচিত শাস্তিও পায় হাতে হাতে।

সে কি? কি ক'রে এই ধ্বংসের পথ বেছে নিলে তোমরা? কই, আমি তো পারলাম না। সভ্যতা কি ক'রে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, আমি তো বুঝতে পারছি না। আত্মার শক্তি, মনোজগতের শক্তির ওপর থেকে কি ক'রে আস্থা হারিয়ে ফেলছে মানুষ? দৈহিক শক্তি, পাশবিক শক্তি বড় হয়ে উঠছে যে! না না ভাই, সামঞ্জস্য কর তোমরা। পুরনো পৃথিবী যে সব ভাগ্যবান ও সর্বহারার দলকে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কর ভাই, নতুবা ধ্বংস অনিবার্য। এ হতে পারে না, কক্ষণো এ হতে পারে না। এই যে পরস্পরের গলা টিপে মারা, এ হতে পারে না।

নিবারণের চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি নামিয়া আসে। শচীন ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলে, রেখে দাও তোমার এই ভাবপ্রবণতা। রেখে দাও তোমার আত্মিক শক্তি। তুমি সৃষ্টির অমোঘ নির্দেশ ধ্বংসকে ভয় কর। ভীতু তুমি, তুমি কাপুরুষ। আধুনিক জগতে তোমার স্থান নেই।

আমি কাপুরুষ?—গর্জিয়া উঠে নিবারণ, আমি কাপুরুষ! জীবনকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে চলেছি, আর আমি কাপুরুষ? তুমি এ কথা বললে?

শচীনও চীৎকার করিয়া উঠে—দাদা, তুমি আমার জন্যে অনেক কিছু করেছ সত্যি, কিন্তু তাই ব'লে কি মনে করতে চাও আমি তোমার এই সব পাগল চিন্তার তল্পীবাহক হয়ে তোমার সঙ্গে থাকব আমার নিজের সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে? আমার নিজের ব'লে কিছুই থাকবে না? তুমি জোর ক'রে আমার ওপর এ সব চাপিয়ে দিতে চাও কোন্ অধিকারে? তুমি না স্বাধীনতার পূজারী, বড়াই ক'রে না কোন কোন সময় সে কথা বল আবার?

শিপ্রার দিকে তাকাইয়া বলে, চল শিপ্রা, চল, এখানে আমাদের স্থান নেই।

চল।

তাহারা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইয়া যায়। মাঠের পথে নামিয়া অতি দ্রুত চলিতে থাকে, ফিরিয়াও তাকায় না। পিসিমা ও নিবারণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন। পিসিমা একবার ডাকিবার চেষ্টা করেন, নিবারণ তাঁহাকে বাধা দেয়।

নির্বাচন-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিয়া সে দিন যখন নিবারণ শুইতে যায়, তখন রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছে। চিন্তার জন্য ঘুম আসিতে চায় না, নানা প্রকার অসম্বদ্ধ চিন্তার ভিতর দিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়। ঘুমাইয়া পড়িলে সে একটি স্বপ্ন দেখে।

সে যেন বেণু-বীণাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছে। কলিকাতার পথে ঘাটে লোকজন খুব কম দেখিয়া নিবারণ বিস্মিত হয়। অনুসন্ধানে জানিতে পারে, বীণাদের কারখানা নাকি বাস করিবার পক্ষে অত্যন্ত আরামপ্রদ স্থান, সেই জন্য ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ লোক নাকি সেখানে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বীণাদের বাড়ির অবিনাশ ব্যতীত আর সকলেই সেখানে চলিয়া গিয়াছে।

নিবারণ ব্যস্ত হইয়া পড়ে। মানুষ সুস্থ দেহ ও মন লইয়া কারখানার ভিতর কি করিয়া বাঁচিতে পারে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না। বীণা এ কি করিতেছে? সে যে সর্বনাশকে ডাকিয়া আনিতেছে! না না, সেই দূষিত আবহাওয়ার ভিতর হইতে তাহাদের বাহির করিয়া আনিতে হইবে যেমন করিয়া হউক। দেরী করা ঠিক হইবে না মনে করিয়া নিবারণ দৌড়াইতে থাকে।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেই বিরাট কারখানার প্রবেশ-পথের সম্মুখে আসিয়া সে থামিয়া যায়। কে যেন হাত তুলিয়া বলে, থাম। নিবারণ

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিতে পারে না—সে কে! ভীষণদর্শন একটি মূর্তি, মানুষের ন্যায় কণ্ঠস্বর বটে, কিন্তু অবয়ব ইস্পাতের মত কৃষ্ণবর্ণ। সাদৃশ্য থাকিলেও মানুষ যে নয়, তাহা নিবারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারে। অদ্ভুত আকৃতি দেখিয়া সে ভয় পাইয়া পিছাইয়া যায়।

সামান্যক্ষণ পরে সাহস সংগ্রহ করিয়া তাহার দিকে না চাহিয়াই প্রশ্ন করে, কে তুমি?

উত্তর আসে, আমি রবট—কৃত্রিম মানুষ।

কৃত্রিম মানুষ! সে আবার কি!—নিবারণ আশ্চর্য হইয়া যায়।

হাঁ হাঁ, কৃত্রিম মানুষ, যন্ত্রে চলি আমি। আমাকে তো তোমরাই তৈরী করেছ।

হা-হা করিয়া হাসে কৃত্রিম মানুষ। নিবারণের দিকে অদ্ভুত চোখ দুইটি ঘুরাইয়া বলে, ভয় পেলে নাকি?

তুমি এখানে কি করছ?

পাহারা দিচ্ছি, কেউ যাতে না ঢুকতে পারে।

আমাকে ঢুকতে দাও। আমি বুঝেছি সব। আমার একজনকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে। তোমার এই কারখানার ভিতরে থেকে সে বদলে যাবে যে। তখন সে যে আমাকে চিনতে পারবে না, আমিও হয়তো তাকে চিনতে পারব না। দাও, ছেড়ে দাও দরজা।

না। হুকুম নেই। আগে রঙ মেখে এস। ওই দেখ রঙ।

নিবারণ দেখে একটি ঘরের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—রঙের ঘর। খোলা দরজার ভিতর দিয়া বহু রঙের পাত্র দেখা যাইতেছে। সে শিহরিয়া উঠে, কৃত্রিম মানুষের দিকে তাকাইয়া হুঙ্কার দিয়া বলে, মানুষের সর্বনাশের জন্যে কল ফেঁদেছ? সব বলছি, সব।

কৃত্রিম মানুষ প্রত্যুত্তর করে, খবরদার, সাবধান হও।

নিবারণ কৃত্রিম মানুষকে আক্রমণ করে। হঠাৎ যেন তাহার নিশ্বাস

বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। বিষাক্ত পেট্রল, কেরোসিন ইত্যাদির ধূমে সে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, ক্ষিপ্রতার সহিত দম লইবার জন্য পশ্চাদপসরণ করে। ভীতভাবে তাকাইয়া দেখে, ধূম বলিয়া যাহা সে মনে করিয়াছিল তাহা তাহার ভ্রম, ধূম নহে। একটি বিরাট অজগরের বিষাক্ত নিশ্বাস। সেই রবটের—কৃত্রিম মানুষের বুকের মধ্য হইতে এক ভীষণকায় অজগর বাহির হইয়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে।

নিবারণ পলাইতে চেষ্টা করে। এমন সময় বুঝি বা চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া চীৎকার উঠে।

চোর, চোর—ধর ধর ধর। এই যে এই দিকে, পালিয়ে গেল রে—পালিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে লাঠির শব্দ হয়। চোর আর্তনাদ করিয়া উঠে।

শালা এবারে যাবে কোথায় চাঁদ?

আবার সেই আর্তনাদ, ম'রে গেলাম, ম'রে গেলাম বাবু।

কোথায় গো খুড়ো, কোথায়?—কে একজন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া হাজির হয়।

এই যে, এই দিকে। শালা এই পথে পালাচ্ছিল।

আবার সেই প্রহারের শব্দ।

নিবারণ ঠিক থাকিতে পারে না, খোঁড়া পা লইয়া সে ছুটিতে থাকে। এই তো কাছাকাছি মাঠের ভিতরে, অনেক লোক আলো লইয়া ছুটিতেছে মনে হয়।

কি হয়েছে? কি হয়েছে? আচ্ছা, সর, সর দেখি সব। আমি দেখছি। ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া চোরকে গিয়া নিবারণ জড়াইয়া ধরে। তখনও সমানে কিল-চাপড় পড়িতেছিল। চোরের মাথা এক জায়গায় ফাটিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

দুই হাত দিয়া চোরকে ঘিরিয়া নিবারণ অনুরোধ করে, আহা, মারবেন না আর, মারবেন না অমন ক'রে। ও কি! ম'রে যাবে যে!

একজন রুখিয়া উঠে—মারব না কেন? মেরে ফেলব শালাকে। সেই বাজার থেকে দৌড়ে দৌড়ে ধরেছি শালাকে—

অপর জন বলে—ওর শাস্তি কি এখনই হয়েছে? এখনও কিছুই হয় নি। ওকে ছেড়ে দেন মাস্টারবাবু, আমরা দেখে নিই ওকে।

প্রথম জন নিবারণের মুখের কাছে আঙুল লইয়া শাসাইয়া বলে—চোরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, মাস্টার মশায়? চোরকে? খুব খারাপ করছেন আপনি, বড় অন্যায় হচ্ছে কিন্তু।

চোরের মুখের কাছে লণ্ঠন ধরিয়া একজন বলে—আরে, এ যে কেষ্ট, নলখোলার দিকে ঘর। লেখাপড়া জানে এ মাস্টারবাবু।

নিবারণ তখন উন্মত্ত জনতাকে থামাইতে ব্যস্ত। হাত জোড় করিয়া সকলকে অনুরোধ করে সে। এমন সময় একজন ভীড়ের মধ্য হইতে বিদ্রূপ করিয়া বলে—ভদ্রলোকের দেখি চোরের জন্য খুব দরদ, বখরা আছে না কি?

এ কথায় নিবারণের ধৈর্য নষ্ট হইয়া যায়। লোকটিকে সে চিনিতে পারে। সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে থাকে—চোর কে না, বলুন? ভাইয়ের জমি জাল দলিলে ফাঁকি দিয়ে দখল করাও কোন সাধু কাজ নয়, আর টাকায় দু আনা হিসাবে মাসে মাসে সুদ আদায় ক'রেও কেউ স্বর্গে যেতে পারে নি কোনদিন। দুটোই চুরি-ডাকাতির চাইতেও বেশী, বুঝলেন? চোরকে দোষ দিয়ে কি হবে, একটু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ভগবানের পথে সহজে ফল পাওয়া যায় না, পেতে দেরী হয়, তাই এ শয়তানের পথ ধরেছিল; একটু বোকা কি না তাই ধরা পড়েছে। এ চুরির জন্যে দায়ী নয়, দায়ী আমরা। ছেড়ে দিন ওকে, আমি ওকে ঠিক ক'রে নিতে পারব।

চোরকে সঙ্গে করিয়া নিবারণ বাসার দিকে চলিতে থাকে, তাহার মুখের উপর কেহই কিছু বলিতে সাহস করে না। চলিয়া গেলে দুই-চারিজন উত্তেজিতভাবে বলাবলি করে—ভদ্রলোকের এতবড় আস্পর্ধা, অপমান ক'রে চ'লে গেল! বিদেশী লোক হয়ে এতবড় সাহস! আচ্ছা, দেখা যাবে পরে। এর ফল কিছুতেই ভাল হবে না খুড়ো, তা আমি ব'লে দিচ্ছি।

মতলববাজ, বুঝলেন মশায়, মতলববাজ। এখানে আসা অবধি কেবল ব'সে ব'সে মতলব আঁটছেন।—পিছন হইতে একজন টিপ্পনি কাটিয়া বলে কথাগুলি।

নির্বাচন আরম্ভ হইবার আর দুই দিন বাকি আছে। সদর হইতে সংখ্যাতীত বাস ভর্তি হইয়া পোলিং ও প্রিসাইডিং অফিসারগণ ভোট গ্রহণ করিবার জন্য মহকুমা সহরের দিকে চলিয়াছে। শতাধিক বাস পর পর চলিয়া আসিয়া জনকপুর হাইস্কুলের খেলিবার মাঠে একত্রিত হইল। স্থানীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দলগুলি বিভিন্ন কেন্দ্রের দিকে চলিয়া যাইতে থাকে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, অভাবনীয় একটি ঘটনা, কল্পনারও অতীত সেই আয়োজন।

মাঠের দুই ধারে দুইটি সভা হইতেছে। একটিতে বক্তৃতা দিতেছে নিবারণ, অপরটিতে শিপ্রা। শচীন মঞ্চের উপর শিপ্রার পাশে বসিয়া আছে।

নিবারণ জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে—প্রশ্ন করেছেন আপনারা, কেন আমরা সমাজের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারলাম না, দুঃখের সামান্য রকম লাঘব পর্যন্ত করতে পারি নি আজ পর্যন্ত? আমি স্বীকার করছি আমাদের দোষের জন্যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের অবনতির জন্যে। তার ওপর আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল না কিছু, নিজেদের উপর বিশ্বাসেরও

অভাব ছিল প্রচুর। বিশ্বাস করুন আমাকে, এবার আমরা সব দিক থেকে একসঙ্গে কাজ আরম্ভ করব। নৈতিক আর্থিক সামাজিক কোন দিকই অবহেলা করব না আমরা। আপনারা নিজেরা চেষ্টা করবেন, সাহায্য করবেন আমাদের। এ তিনটির যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে উন্নতির চেষ্টা করা বৃথা।

এমন সময় অপর মঞ্চে শিপ্রা দেবীকে বলিতে শোনা যায়—আপনারা মিষ্টি কথাতে ভুলবেন না যেন। আপনাদের দেখা দরকার—দেশের কোন কাজের ভেতরই যেন এই সব সাংঘাতিক লোক ঢুকতে না পারে, যারা চোরকে প্রশ্রয় দেয়, চোরাকারবার করে। ঘন ঘন হাততালি পড়ে সভাতে। কাহারা যেন ধ্বনি তোলে—চোরকে প্রশ্রয় দেয় কে ?

নিবারণবাবুর দল। নিবারণবাবুর দল—চোরের দল।

ধ্বনি করিতে করিতে এই সভার কতকগুলি লোক উন্মত্তের ন্যায় নিবারণের সভার দিকে ছুটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ইষ্টক বর্ষণ আরম্ভ হইয়া যায়।

উঃ! হাত দিয়া মাথা চাপিয়া ধরে নিবারণ। ঝরঝর করিয়া কপালের পাশ হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়ে। কে যেন এক খণ্ড ইঁট ছুঁড়িয়া মারিয়াছে—লক্ষ্য অব্যর্থ।

অপর সভামঞ্চের দিকে তাকাইয়া নিবারণ একবার মাত্র বলে—অকৃতজ্ঞ। তারপর হঠাৎ পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া চলে—তোমরা না মানব-জাতির জন্যে সংবিধান রচনা করেছ, চিন্তার স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা? কোথায় তোমাদের সেই বিশ্বপ্রেম? ধিক তোমাদের সভ্যতাকে!

সে আর কথা বলিতে পারে না, অজ্ঞান হইয়া মঞ্চের উপর পড়িয়া যায়।

রক্তবর্ণ আকাশ লইয়া পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নামিয়া আসে।

আবছায়া অন্ধকারের ভিতর লাঠি-কাঁধে কে যেন মাঠের দিকে দৌড়াইয়া যায়। বোধ হয় পচু।

রাস্তা হইতে মাঠে নামিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়ায়। মনে পড়ে মাস্টারবাবুর কথা। মাস্টার একদিন বলিয়াছিলেন—ক্ষমা ও সহনশীলতার ভিতর দিয়া নবজীবনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। ক্ষুধার্ত পৃথিবী ডাকিয়া বলিতেছে, আরও চাই, আরও চাই—আমি ক্ষুধার্ত, ম্যয় ভুখা হুঁ। আরও ত্যাগের জন্য, আরও অনেক আত্মবলিদানের জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। জীবনের উন্মেষের ও বিকাশের জন্য—জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বিসর্জনের ডাকে সাড়া দিতে হইবে।

লাঠি ফেলিয়া দিয়া পচু মাটির উপর বসিয়া পড়ে, দুই হাতে মুখ চাপিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

রাত্রি প্রায় বারোটা। হাসপাতালের পৃথক একটি কামরায় নিবারণকে রাখা হইয়াছে। পিসীমা কাছে ছিলেন এতক্ষণ, এইমাত্র তাঁহাকে কোন প্রকারে বাহিরে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে জ্ঞান হয় নাই নিবারণের।

ধীরে ধীরে বউদি কাছে আসিয়া বসেন। ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবারণের মুখের উপর একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন তিনি, টস টস করিয়া তাঁহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়ে।

হঠাৎ চোখ মেলিয়া তাকায় নিবারণ। বউদি ভাবেন, বুঝি বা জ্ঞান হইল।

সে মুখে যন্ত্রণার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। মুখখানি ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দেয়। তারপর চোখে কেমন যেন এক আবেশ লইয়া, বউদির মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া হাসি হাসি মুখে থামিয়া থামিয়া বলে—বউদি, চ'লে যাচ্ছি আমি। দেখুন,

কেমন সুন্দর চ'লে যাচ্ছি, না ? এ যুগে মানুষ যা প্রতিজ্ঞা করে বউদি, পরের যুগে তা ভুলে যায়। মানুষ বলে—বিকাশের সুযোগ দেব ; কিন্তু দেয় না—বঞ্চিত করে। মানুষ বলেছে—মানুষ সত্য, কিন্তু মর্যাদা মানুষ মানুষকে দেয় নি—উপহাস করেছে। মানুষের এই কৃত্রিমতা কবে ঘুচবে বউদি ? কবে ? তবুও কি সুন্দর এই পৃথিবী, কি সুন্দর তার মানুষ, না ? দুঃখ কিসের, আবার আসছি ফিরে। আর ফিরেই বা আসব কেন, রয়েছি তো এখানেই অন্যরূপে। সে-ই আবার একটু পরে কথা বলতে শুরু করবে দেখো। আশীর্বাদ কর, সুন্দর যেন সে হয় আর সুন্দর করবার মত প্রাণপ্রাচুর্য যেন তার থাকে। একা যেন সে চলতে পারে—একা—বউদি, একা।

বউদি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠেন।

সেই রাত্রিতে বীণা তখন সেতারে বেহাগের আলাপ করিতেছিল। কি করুণ সে মূর্ছনা ! পাশের খাটে দাদু তখন নীরবে শুইয়া ছিলেন। জনকপুরের টেলিগ্রামটা দাদুর চশমার খাপ দিয়া টেবিলের উপর চাপা ছিল।

মোমবাতিটা হঠাৎ কেন যেন নিবিয়া যায়। বীণা ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠে—নিবে গেল। নিবে গেল কেন মোমবাতিটা ? দাদু, ও দাদু, বাতিটা কেন নিবে গেল অমন ক'রে ? সেতারের উপর মুখ রাখিয়া সে ব্যথায় ভাঙিয়া পড়ে।

দাদু পাশ না ফিরিয়াই বলেন, নিবুক ওটা, আর ধরাতে হবে না তোমাকে। এই নিবিড় দুঃসহ অন্ধকার তুমি নীরবে সহ্য কর দিদি।

জীবনের ঝঙ্কার অজগরের বিষাক্ত নিশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সমাপ্ত